Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়:

পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নে:

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

দাওয়াহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেন:

সাবিহা মাহমুদ

রোল: 23100120386

৩১শে মে, ২০২৬ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়:

পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নে:

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

দাওয়াহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেন:

সাবিহা মাহমুদ

রোল: 23100120386

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবিহা মাহমুদ, আইডি: 23100120386 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নে:
মাওলানা মাহবুবুর রহমান
দাওয়াহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনাল:
মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য"** শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলোর তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sabiha

সাবিহা মাহমুদ
আইডি: 23100120386
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

তারিখ:
৩১শে মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 6
ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব 10
মুসলিম পরিবারে পিতা-মাতার গুরুত্ব ও অধিকার 13
জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার জন্য করনীয় 16
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার বা উত্তম ব্যবহার 16
পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া 20
সদা পিতা-মাতাকে খুশি রাখা 22
পিতা-মাতার সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা 23
পিতা-মাতার আনুগত্য করা 25
পিতা-মাতার কাজে সহযোগীতা করা 28
পিতা-মাতার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা 30
পিতা-মাতার দু'আ নেওয়া 34
পিতা-মাতাকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা 36
পিতা-মাতার আদবের প্রতি খেয়াল রাখা 37
পিতা-মাতার নাম আলোকিত করা 40
পিতা-মাতার চোখের শীতলতা দানকারী হয়ে যাওয়া 43
পিতা-মাতার সাথে নেক আচরণ করা ও পিতা-মাতার জন্য কল্যাণকামী হওয়া 44
পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরে করণীয় 47
পিতা-মাতার জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা 47
পিতা-মাতার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করা 51
পিতা-মাতার অনাদায়ী ঋণ আদায় করা 52
পিতা বন্ধু ও মাতার বান্ধবীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা 55
পিতা-মাতার আত্নীয়-স্বজনের সাথে সদাচারণ 55
পিতা-মাতার কবর জিয়ারত 56
পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের জন্য ঈসালে সওয়াব করা 57
সন্তানের গুরুত্ব ও সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় 59
সন্তানের জন্মের পূর্বে করণীয় 62
পিতা-মাতার নেককার হওয়া 62
সহবাসের দু'আ পড়া 64

নেক সন্তানের জন্য দু'আ করা 65
গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দু'আ করা 68
সন্তানের জন্মের পরে করণীয় 70
তাহনিক করানো 70
সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নাম রাখা 71
আকিকা করা 74
ছেলে বা মেয়ে যাই হোক হীনমন্য না হয়ে উত্তম তরবিয়ত করা এবং আল্লাহর আছে দু'আ করা 89
সন্তানদের প্রয়োজনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং তাদের অভিযোগ-অনুযোগ মনযোগ দিয়ে শোনা 90
সন্তানের অবসর সময়কে কাজে লাগানো 92
পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পারিক সম্পর্কের প্রভাব 97
আধুনিক সমাজে চ্যালেঞ্জ ও করনীয় 99
উপসংহার 101
তথ্যসূত্র 102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

নিশ্চয় সকল প্রশংসার একমাত্র উপযুক্ত মহান আল্লাহ। আমরা কেবল তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই ও ক্ষমাপ্রার্থনা করি। প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও খারাপ কাজ থেকে আমরা আশ্রয় চাই আল্লাহরই দরবারে। তিনি যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথচ্যুত করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখানোর মতো কেউই থাকে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

“হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা প্রকৃত মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।” (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

আরো ইরশাদ হয়েছে,

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার অসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাক। আর সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।” (সূরা নিসা: ১)

মানুষের প্রধানতম ফরয বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন এবং তার নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য বা বন্দেগী। এরপরই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক জীবন সংশোধন ও পুনর্গঠনের চিন্তা করা একদিক দিয়ে সামাজিকভাবে যেমন প্রয়োজন, তেমনি এটা একটা দ্বীনী কর্তব্যও।

পারিবারিক জীবনের পর শুরু হয় বংশীয় জীবনের সীমা। এ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতা। মাতা-পিতার উঁচু মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বর্ণনাভঙ্গি থেকেই ধারনা করা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

“এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ্! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভর্ৎসনা করে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দু’আ করতে থাকো যেমন, হে পরওয়ারদিগার! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও অকৃত্রিম স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।” (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪)

পবিত্র কুরআনের এ দু'টি আয়াত বার বার পাঠ করলে এবং এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কয়েকটি জিনিস সুন্দরভাবে ধরা দেবে:

প্রথমত, মুমিনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। কুরআনুল কারীমে রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অতঃপর এ তাকিদ একই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন আবশ্যিকভাবে তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয় এবং বয়সের কারণে এমন সব কথাও তাঁদের দিক থেকে আসা শুরু হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত। মুসলমানদের উচিত, এ বার্ধক্যের বয়সে মাতা-পিতার রুক্ষ

মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের প্রতিটি কথা খুশীর সাথে মেনে নেয়া এবং তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার জবাব না দেওয়া।

সন্তানদেরকে শৈশবের কথা স্মরণ করতে হবে। সে সময় তারা না বুঝে কত ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং নিরর্থক কথা বলে মাতা-পিতাকে পেরেশান করতো। কিন্তু পিতা-মাতা হাসিমুখে তাদের কথা শুনতেন, খুশী হতেন, স্নেহমাখা স্বরে জবাব দিতেন এবং কখনো বিরক্ত হতেন না।

তৃতীয়ত, মাতা-পিতার মান-মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাঁদের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল দিতে হবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে যখন শক্তি কমে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ মাতা-পিতার মান-সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। নিজের মত সম্পর্কে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন। বার বার গোস্বা করেন। বিভিন্নভাবে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। হাসিমুখে তাঁদের সেইসব কথা সইতে হবে এবং কোনো সময় বিরক্ত হয়ে এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

চতুর্থত, আচার-আচরণে তাঁদের সাথে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে হবে। অনুগত হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের সামনে মাথা নীচু রাখা আবশ্যক। তাঁদের সব নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তা পালন করে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। বার্ধ্যক্যে মাতা-পিতা যখন সন্তানের সব ধরনের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন তখন একজন অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁদের খিদমত আঞ্জাম দেওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু কোনো কথা ও কাজ থেকে যেন অহমিকা এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ না পায়। বরং সন্তানসুলভ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গৌরব অনুভব করা উচিত এবং এ খিদমতের সুযোগ লাভে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা দরকার।

পঞ্চমত, মাতা-পিতাকে অসহায় ও দুর্বল বয়সে পেয়ে নিজের শৈশবের সেই সময়ের কথা স্মরণ করা দরকার, যখন শিশু অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় ও মজবুর থাকে। তখন মাতা-পিতার কত স্নেহ-ভালোবাসা এবং মনোযোগ দিয়ে শত ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শিশুর লালন-পালন করেন। শিশুর আনন্দে আনন্দিত হন এবং তার কষ্ট দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করে মুহব্বত ও রহমতের আবেগে অবলীলাক্রমে বার বার দু'আর

জন্য উঁচিয়ে বলতে থাকে, হে পরওয়ারদিগার! যেমন শৈশবকালে স্নেহ ও মুহব্বতের সাথে তাঁরা জান-প্রাণ দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছিলেন, তুমিও তাঁদের প্রতি রহম করো ও তাঁদের মুশকিল আসান করে দাও।

কুরআনুল কারীমের এ দু'আয়াতে যে কথাগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত বা হাদীসে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়।

ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হলো পরিবার। আর বিয়ে হল স্বীকৃত বুনিয়াদী পারিবারিক বন্ধন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিয়ে ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার গঠন হলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পরিকল্পিত উপায়ে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদি দায়িত্ব সুসম্পন্ন করা সম্ভব। এটাই ইসলামের কাম্য। কেননা ব্যক্তিগত বিশ্বাসসূচক ধর্মীয় মতবাদ ছাড়াও ইসলামের রয়েছে একটি সামাজিক চরিত্র এবং সম্পর্ক। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধুমাত্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বরং একটি পবিত্র সংস্থা। পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। বহুসংখ্যক পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠে সমাজ। আর সমাজেরই বিকশিত ও সুসংগঠিত রূপ হলো রাষ্ট্র।

সমাজকে টিকে থাকার জন্য পরিবারপ্রথার বিকল্প নেই। অতএব সমাজ ও কৃষ্টিগত সুস্থতার জন্য পরিবার অপরিহার্য। নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে মানবসমাজ। আর নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল ও তীব্র আকর্ষণ প্রকৃতিগত করে দেওয়া হয়েছে। উভয়ের মধ্যে মিলনই হলো তাদের প্রাকৃতিক দাবি। এ মিলন যদি হয় লাগামহীন পন্থায় তবে সমাজ ও তমদ্দুনে ফিতনা-বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়াই অবধারিত। বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত বিধি ও পন্থা অনুযায়ী নারী-পুরুষের সঠিক সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে সমাজসভ্যতার সুস্থতা ও নিরাপত্তা। তাদের উভয়ের মধ্যে খোদায়ী বিধি অনুযায়ী এ সম্পর্ক কেবল বিয়ের মাধ্যমেই হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে সূচনা হয় পারিবারিক জীবনের। বৈধ পারিবারিক জীবন ছাড়া মানুষের দাম্পত্য জীবন কোনো অবস্থাতেই সুখের হতে পারে না, স্বাচ্ছন্দ্যের হতে পারে না। (ইসলামের পরিবারিক জীবন, পৃ. ১৩)

সমাজে সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পরিবার ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ক্ষেত্রবিশেষ থাকতে পারে; কিন্তু সাধারণভাবে নেই। পরিবারের রয়েছে আরো ভিন্নতর এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা। সন্তানের সুশিক্ষার জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। পরিবারেই মুসলিম শিশু ও বয়স্করা পেয়ে থাকেন ধর্মীয় শিক্ষণ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা। পরিবারেই একজন আরেকজনের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত হয়ে থাকে। আর তা থেকে সৃষ্টি হয় সামাজিক আনুগত্য। সর্বোপরি, মানুষ সামাজিক জীব, তাই তারা একে অপরের সাথে মিলে-মিশে থাকতে চায়। এটাই তার স্বভাব বা প্রকৃতি। বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন মানুষের প্রকৃতিবিরোধী। আত এজন্য মানুষের পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। মহান আল্লাহ প্রেম, প্রীতি ভালোবাসা দয়া, স্নেহ ও সহানুভূতি মানুষের প্রকৃতিজাত করে দিয়েছেন সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ, দয়া এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেমপ্রীতি মানুষের

চিরন্তন প্রকৃতিজাত নিয়ম। এসব শুভ মানবিক গুণাবলিই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মর্যাদা দান করেছে। এসব গুণাবলি সংরক্ষণের জন্য যে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১৪)

মানব সন্তানের মানবিক শান্তির মূল উৎস হলো একজন অপরজনের প্রতি দরদ এবং সহানুভূতির প্রকাশ। পরিবার ছাড়া জীবনের যাত্রাপথে কোনো নিরাপত্ত থাকে না। সামাজিক, মানবিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ পরিবারেই সবচেয়ে বেশি পারস্পরিক সহযোগিতা পেয়ে থাকে। পরিবার ছাড়া একটি শিশুর পক্ষে সুসন্তান হিসেবে গড়ে উঠা অতীব কষ্টকর। জীবনের শেষ পর্যায়ে যে মানবিক সেবা ও সহানুভূতি মানুষের দরকার তা পরিবারের বাইরে অন্য কোথাও ততটুকু পাওয়া যায় না। পিতৃ-মাতৃহীন এবং নিঃসন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠে পরিবার। অসুস্থ, বিকলাঙ্গরা পরিবারে যতটুকু প্রীতি স্নেহ পেয়ে থাকে অন্যাত্র তা পায় না।

এ জন্যই মানবসমাজে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অপরিহার্য। পরিবারকে বল হয় একটি সুরক্ষিত দুর্গ। পরিবারের সদস্যদের সর্তক প্রহরায় এ প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গরূপ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে সর্ব প্রকার অযত্ন, অবহেলা, অযাচিত হস্তক্ষেপ, অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ, নির্যাতন, নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছে। পরিবারে প্রতিটি সদস্য একে অপরের নিকট থেকে ধর্ম, প্রাণ, মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। তাই দেখা যায়, যুগ যুগ ধরে মুসলিম পরিবারে যুবক-যুবতী ভাই-বোন, পিতা তার যুবক-যুবতী পুত্র-কন্যা, আর প্রবাসী স্বামীর বিরহ যাতনা-কাতর মাতা অনেক জনপদেই একত্রে বসবাস করে চলছে। কিন্তু শরী'আত শাসিত এ পরিবারে কখনও কোনো বিপর্যয় নেমে আসেনি। এমনকি নৈতিকতার বন্ধনও ছিন্ন হয়নি কখনও। পবিত্রতার এক লীলাভূমি হচ্ছে পরিবার। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি সংগঠিত হচ্ছে পরিবারে, পরিবার সংগঠিত হচ্ছে সমাজে আর ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ সমাজ সংগঠিত হচ্ছে রাষ্ট্রে। এভাবেই বিশ্ব সমাজ তথা মানবসন্তানদের নিয়ে বিশ্বপরিবার গঠিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম যথার্থই বলেছেন, "কুরআনে পরিবারকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবনযাপনকারী নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েকে বলা হয়েছে محصنين লোকগণ। দুর্গ যেমন শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য, তার ভিতরে জীবনযাত্রা যে রকম নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সর্বপ্রকারের আশঙ্কামুক্ত, পরিবারের নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়ে নৈতিকতাবিরোধী পরিবেশ ও অসৎ অশ্লীল জীবনের হাতছানি বা আক্রমণ থেকে তেমনিই সর্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। বস্তুত পরিবারস্থ ছেলেমেয়ের পক্ষে পিতামাতা, ভাই-

বোনের তীব্র শাসন ও নিকটাত্মীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে পথভ্রষ্ট হওয়া বা নৈতিকতাবিরোধী কোনো কাজ করা খুব সহজ হতে পারে না। (পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ৮১)

পারিবারিক জীবনের এ দুর্গপ্রাকার রক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য সর্বপ্রথম অপরিহার্য কর্তব্য। এ সম্পর্কিত কুরআন মাজীদের প্রাসঙ্গিক আয়াত হলো, "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও 'ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদিগের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হইলে 'উফ' বলিও না এবং উহাদিগকে ধমক দিও না; তাহাদিগের সহিত বলিও সম্মানসূচক নম্র কথা। মমতাবশে তাহাদিগের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদিগের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তাঁহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

ইসলামে পরিবার শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পরিবারের পরিসর আরো ব্যাপক। নিকটাত্মীয়-স্বজনও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাদের সাথে সম্পর্ক শুধুমাত্র দয়া, করুণা এবং সহানুভূতির নয়; এর জন্য আছে ইসলামের বিশেষ বিধান। উপরন্তু, পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার প্রতি ইঙ্গিতবহ এমন অনেক আয়াত২৬ আল কুরআনে রয়েছে। পরিবাররীতিও পারিবারিক বন্ধন ছাড়া আল কুরআনের সেসব নির্দেশ ও দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না এবং পারিবারিক পরিবেশ ব্যতীত এরূপ শান্তিময় জীবন লাভ করা সম্ভবই হতে পারে না। পরিবার ও পারিবারিক জীবনের এ অপরিসীম গুরুত্বের কারণে সেসব বিধি-ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক করে দেওয়া হয়েছে। যাতে পরিবারে সুখ-শান্তি মাধুর্যময় হয়ে ওঠে এবং পরিবারকে ধ্বংস করে, পারিবারিক জীবন বিষাদময় করে তোলে এমনসব কাজকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে।

মুসলিম পরিবারে পিতা-মাতার গুরুত্ব ও অধিকার

পিতামাতার উপর যেমন সন্তানের হক রয়েছে, তেমনি সন্তানের উপরেও পিতামাতার হক রয়েছে, যা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক হলো পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। ইসলামে পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, পারস্পরিক কর্তব্য ও অঙ্গীকার দ্বারা নিবিড়ভাবে সুসংবদ্ধ। কিন্তু বয়সের পার্থক্যটা কখনও কখনও এত বিরাট হয়ে দাঁড়ায় যে, তা পিতামাতাকে শারীরিক দিক থেকে দুর্বল ও মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলে। এর প্রায় সাথে সাথে আসে অসহিষ্ণুতা, শক্তির অবক্ষয়, অত্যধিক স্পর্শকাতরতা এবং সম্ভবত ভুল ধারণা। এর পরিণাম পিতামাতার কর্তৃত্বের অপব্যবহার কিংবা আন্তঃপুরুষ বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতা পর্যন্ত গড়াতে পারে।

সম্ভবত এসব বিষয় বিবেচনা করে ইসলাম কতিপয় মৌল শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক রক্ষার মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সারাজীবন ধরে পিতামাতা ভালোবাসা, কোমল অনুভূতি এবং বৃদ্ধ বয়সে অধিকতর সেবা-শুশ্রূষা প্রাপ্য। পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতা ও সন্তানের পরস্পরের পরিপূরক সম্পর্ককে অতি সংক্ষেপে ইহসান-এর ব্যাপকতম ধারণার মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে, যা সত্য, ন্যায় ও সুন্দরকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

“হযরত আবি উমামাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।” (সুনানে ইবনে মাজাহ-৩৬৬২)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ ইরশাদের মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাঁদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسُخْطُ اللَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدِ

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (তিরমিযী, মিশকাত পৃষ্ঠা ৪১৯)

পিতা-মাতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ-উদ্রেককারীরা আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ - أَرَدْتُ أَنْ اَغْزُوَ. وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيرُكَ؟ فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ. نَعَمْ ، قَالَ فَالْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا

“হযরত জাহিমা (রা.)-এর পুত্র হযরত মাবিয়া (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? জাহিমা (রা.) বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের তলাতেই তোমার বেহেশত।” (সুনানে ইবনে মাজাহ)

‘তাঁর পায়ের তলায় তোমার বেহেশত’ কথাটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ হলো, তাঁকে পুরোপুরি সম্মান এবং আচার-আচরণে অত্যন্ত বিনয় দেখাতে হবে। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর খিদমত ও খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে।

উপরের হাদীসে পিতার অনুগত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং এ হাদীসে মাতার আনুগত্য ও খিদমতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীস তিবরানিতে মাতা ও পিতা উভয়ের কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত জাহিমা (রা.) স্বয়ং বলেছেন, আমি হুজুর (সা.)-এর খিদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে আমি আপনার মত জানতে চাই। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার

মাতা-পিতা (জীবিত) আছেন? আমি আরজ করলাম, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, যাও, তাঁদের খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁদের পায়ের নীচেই তোমার বেহেশত রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

“হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতা উভয়েকেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথবা কোনো একজনকে অতঃপর (তাঁদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করলো না।” (মুসলিম-২৫৫১)

জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার জন্য করনীয়

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার বা উত্তম ব্যবহার

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

“আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালনপালন করেছেন।” (সূরা আল ইসরা: ২৩-২৪)

আবু বকর আল আনবারি বলেন, “আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশনা দ্বারা শুধু অভিমত প্রকাশ পায় না বরং অবশ্য পালনীয় আদেশ এবং একটি বাধ্যবাধকতা বর্ণনা করা হয়েছে।”

এবার আয়াতদুটো ভেঙে ভেঙে দেখা যায় যে,
بِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ‘পিতা-মাতার প্রতি ইহসান দেখাও।’
অর্থাৎ, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, তাদের খেদমতে সুন্দর ব্যবস্থাপনা করা, তাদের সম্মান দেখানো, তাদের প্রতি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞত থাকা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (তাদেরকে এমনভাবে সম্মান দেখানো যে) তাদের সামনে নিজের কাপড় না ঝাড়া দেওয়া যাতে কাপড়ের ধুলো তাদের ওপর পড়ে।

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ ‘তাদেরকে উফ শব্দটিও বলো না।’
আমি আমার শিক্ষক ভাষা বিশেষজ্ঞ আবু মানসুরের কাছ থেকে শিখেছি 'উফ' হলো উড়ন্ত ধূলিকণা বা ওরকম ক্ষুদ্র কোনো কিছু যা গায়ের ওপর পড়ে। সেই অনুসারে শব্দটি দ্বারা অতি নগণ্য কিছু বোঝাতে ব্যবহার করি।
(অর্থাৎ, তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য, বিরক্তি দেখানোর জন্য কিংবা অসম্মান প্রদর্শনার্থে এমন ‘উফ’ এর মতো নগণ্য কথাও তাদেরকে না বলা।)

وَلَا تَنْهَرْهُمَا ‘তাদেরকে ধমকের সুরে কথা বলো না।’
অর্থাৎ, তাদের সাথে কর্কশ ভাষায়, অভদ্রতার সাথে কথা বলো না অথবা তাদের সাথে উঁচু গলায় কথা বলো না। (কথা বলার ক্ষেত্রে যদি এরকম সতর্ক হবার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতটা বিনয় দেখানো দরকার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।)

وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ‘সম্মানজনক উপায়ে তাদের সাথে আলাপ করো।'
অর্থাৎ, বিনয়ের সাথে, সামর্থ্যানুযায়ী সবচেয়ে উত্তম উপায়ে তাদের সাথে কথা বলবে। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেন, 'উদ্ধত আর রাগী মালিকের সাথে দাস যেরকমভাবে কথা বলে সেভাবেই কথা বলার আদেশ প্রদান করা হয়েছে এই আয়াতাংশে।’

وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ ‘ আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও।'
(পাখি যেমন পরম মমতায় তার ছানার জন্য নিজের ডানা দিয়ে ঢেকে দিয়ে তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে, তেমনি তাদের জন্য) দয়া আর ভালোবাসার অনুভূতি তোমার হৃদয়ে লালন করো।

পিতা-মাতার অধিকারকে পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কার করা হয়েছে,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

“আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করো।” (সূরা লুকমান: ১৪)

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের শুকরিয়া আদায়ের আদেশের সাথে পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায়কেও সংযুক্ত করে এর গুরুত্ব যে ঠিক কতখানি তা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে।” (সূরা আহকাফ: ১৫)

কুরআনুল কারীম পিতা-মাতা উভয়ের সাথেই সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষত মায়ের সাথে কারণ, মা তিন ক্ষেত্রে পিতার চাইতে বেশি কষ্টের স্বীকার হয়ে থাকে। যদিও সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে মায়ের সাথে পিতাও শরীক। তবে মা অতিরিক্ত তিনটি কষ্ট বেশি করে থাকে। যাতে পিতা শরীক থাকে না। তা হল- গর্ভ ধারনের কষ্ট, প্রসবের কষ্ট এবং দুধ পান করানোর কষ্ট।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে নবীজির নির্দেশনা:
মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন, "তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না; এমনকি তোমাকে যদি তোমার পরিবার এবং সম্পদকেও ত্যাগ করতে বলে।" (ইরওয়াউল গালিল, (৭/৮৯); সহীহ আত তারগীব, ২৫১৬)

আহমাদ বলেন, ইয়াহিয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবু জা'ইব থেকে, তিনি তার মামা আল হারিস থেকে, তিনি জামুরাহ থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন; ইবনে উমর বলেন, "আমি এক মহিলাকে বিয়ে করার পর আমার বাবা তাকে অপছন্দ করলেন, তিনি ঐ মহিলাকে তালাক দিতে বললে আমি রাজি হইনি। তখন আমার বাবা বিষয়টি রাসূল -কে জানালে নবীজি আমাকে বললেন, 'তোমার বাবার কথা মেনে না।' " (আবু দাউদ: ৫২৩৮; তিরমিজি: ১১৮৯; নাসাঈ: ৫৪৬৪)

উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না, এমনকি যদি তারা তোমাকে সবকিছুও ত্যাগ করতে বলে তাহলে তুমি তাই করো।" (মাজমু আল জাওয়াইদ: ৪/২১৯)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, "তুমি তোমার বাবার প্রতি সদাচারী হও, (ভবিষ্যতে) তোমার সন্তানও তোমার প্রতি অনুগত হবে।" (লিসানুল মিজান: ৬/৮)

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَض : أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ابْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أحدٌ حَى؟ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا حَى, قَالَ فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ ؟ قَالَ. نَعَمْ ، قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.

“হযরত আমর ইবনুল আছ (রা.)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, এক ব্যক্তি প্রিয় নবী (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। বরং আল্লাহর শোকর যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো।” (মুসলিম-২৫৪৯)

দীনে হিজরত ও জিহাদের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে? এ সত্ত্বেও যদি মাতা-পিতা বার্ধক্য, দুর্বলতা অথবা কোনো মাজুরীর কারণে সন্তানের সাহায্য ও খিদমতের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে সন্তান তাঁদের খিদমত এবং আরাম প্রদান করে আল্লাহর প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষী হবে। আর তাতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ ধরনের অসহায় অবস্থায় ইসলামে মাতা-পিতার সান্নিধ্যে থেকে খিদমত করা হিজরত ও জিহাদের মতো উত্তম আমলের চেয়েও অতি উত্তম কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মাতা-পিতাকে কাঁদায়ে রেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “যাও, মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো।” (আবু দাউদ)

তিনি আরো বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হলো। প্রয়ি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, জীবিত আছেন। তিনি বললেন, যাও, তাঁদের খিদমত করতে থাকো। এটাই জিহাদ।
(মুসলিম, আবু দাউদ)

পিতা-মাতার প্রতি সদাচার: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িকে দেখিয়ে আবু আমর আশ শাইবানি বলেন,

“এই বাড়ির মালিক রাসূল -এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে

প্রিয় কাজ কোনটি?' সে সম্পর্কে। নবীজি বলেছিলেন, 'সময়মতো সালাত আদায় করা।' তারপর আবার জানতে চাইলেন, 'তারপর কোন কাজটি?' নবীজি বলেছিলেন, 'বিররুল ওয়ালিদাইন অর্থাৎ, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ।' অতঃপর আবার জানতে চাইলেন, 'তারপর কোনটি?' নবীজি বলেছিলেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' (সহিহ বুখারী: ৪৯৮; সহিহ মুসলিম: ১২৫)

নামাযের গুরুত্ব এবং ফযিলত সম্পর্কে কোনো মুসলমান অনবহিত নন। তারপরও নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের সাথে সাথে প্রিয় নবী কারীম (সা.) যে নেক আমলের তাকিদ দিয়েছেন, দ্বীনে তার কি ধরনের গুরুত্ব হতে পারে। মাতা-পিতা এবং সন্তানের মধ্যে তো সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের মধ্যে নেক আচরণ ও ভালোবাসার সম্পর্ক তো রক্তের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিটি মুমিন মাতা-পিতাকে ভালোবেসেই থাকে এবং যতদূর সম্ভব মন ও অন্তর দিয়ে তাঁদের খিদমত করে। কিন্তু প্রিয় নবী কারীম (সা.)-এর তাকিদের অর্থ হলো এ সম্পর্কে শুধু বংশীয় এবং ইহকালের সম্পর্কই নয় বরং এটা একটা দ্বীনি ব্যাপারও বটে। আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহর আনুগত্যের দাবীই হলো মাতা-পিতার সাথে নেক বা সুন্দর আচরণ করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ হলো যে, তাঁদের অনুগত থাকা এবং খিদমত করা। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বিভিন্নভাবে খুশী রাখার চেষ্টা করা। কোনো মুসলমান যদি মাতা-পিতার অনুগত না হয় তাহলে সে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) ও অনুগত হয় না। সে শুধু বংশীয় ও ইহকালীন অপরাধীই নয়, বরং সে আল্লাহর নিকটও অপরাধী। এর জন্য আল্লাহর নিকট তাকে জবাবদিহিও করতে হবে।

পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

“অতএব তুমি আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শোকর আদায় কর।” (সূরা লোকমান: ৩)

আল্লাহর শোকর হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। আর পিতা-মাতার শোকর হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর তাদের জন্য দুআ করা। পিতা-মাতা হলো বাহ্যিক কারণ আমাদের দুনিয়াতে আগমন করার এবং তারা আমাদের জন্য জীবনে বহু কষ্ট করে থাকেন। আর আল্লাহ হলেন-প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। এজন্য তিনি তার শোকর আদায় করার সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর আদায় করার তাকিদ দিয়েছেন।

এক হাদীসে এসেছে-এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিজের মায়ের মন্দ আচরণ ও বদ আখলাকের অভিযোগ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আচ্ছা তুমি কি সে মহিলার (তোমার মায়ের) সব দয়ার প্রতিদান দিয়ে দিয়েছো?
সে বলল আমি তাকে কাঁধে করে হজ্জ করিয়েছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তুমি তার খেদমতের বোঝা এখনোও ফেরত দাওনি। তাকে যখন বারবার তার মায়ের ইহসানসমূহের কথা স্বরণ করাতে লাগলেন-তখন তার অনুভূতি হলো যে, মা (এখন যা করছেন) এর চেয়ে বেশিও যদি করেন তাহলেও তা সহ্য করা তার জন্য জরুরী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

“যে ব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহর শোকর আদায় করে না।”

অনেককে দেখা যায় এ অভিযোগ করে যে, মাতা-পিতার জন্য বহু খচর করেছি। আর কত? তাকে বলবো, তুমি কিছুই করো নি। তোমার মায়ের কষ্টের সামনে তা কিছুই নয়। স্বয়ং পিতা-মাতার জন্য প্রশান্ত মনে খরচ করা চাই।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কি খরচ করবে? আপনি বলে দিন তোমরা যা খরচ করবে এর মধ্যে সর্ব প্রথম হকদার হলো মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়গণ।” (সূরা বাকারা: ২১৫)

প্রত্যেক যুবকের উচিৎ তার মাতা-পিতার শোকর আদায় করা। যখন দিলে তাদের শোকর আদায় করার আগ্রহ জন্ম নেবে তখন তাদের খেদমত করারও আগ্রহ জন্ম নেবে। আল্লাহ পাক আমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার তাওফিক দান করুন।

সদা পিতা-মাতাকে খুশি রাখা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ

"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি।"
যদি কেউ আল্লাহকে খুশি রাখতে চায় তার জন্য জরুরী হল সে যেন তার পিতাকে সন্তুষ্ট রাখে। আর যে ব্যক্তি তার পিতাকে নারাজ করল সে যেন আল্লাহ পাককে নারাজ করল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতার আদেশ পালন করে তার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খুলে যায়। আর যদি মাতা-পিতার কোন একজন জীবিত থাকে আর তার ফরমাবরদার হয়, তাহলে তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে যায়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের নাফরমানী করে তার জন্য জাহান্নামে দুটি দরজা খুলে যায়। আর যদি পিতা-মাতার কোন একজন জীবিত থাকে। আর সে তাদের কোন একজনের নাফরমানী করে তাহলে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে যায়। তা শুনে এক সাহাবী আরয করল যদি মাতা-পিতা তার উপর জুলুম করে থাকে, তাহলেও? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যদি মাতা-পিতা তার উপর জুলুম করে, তাহলেও। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।" (মেশতাক শরীফ)

উল্লেখিত হাদীসগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক যুবকের কর্তব্য হল সদা নিজের মাতা-পিতাকে খুশি রাখা। তাদের অসন্তুষ্টি মূলক কোন কথা না বলা, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বৃদ্ধ বয়সে তাদের মন মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। এ সময় তাদেরকে খুশি রাখা একটি মুশকিল বিষয়। তবে যদি কোন সন্তানের সামনে মাতা-পিতাকে খুশি করার যে ফজিলত ও গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো থাকে, তাহলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে। যদি সন্তান

তার শৈশব কালে পিতা-মাতার কষ্ট ক্লেশের কথা চিন্তা করে, তাহলে তার কাছে এটি কিছুই মনে হবে না।

পিতা-মাতার সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা). হযরত শাব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি চাও যে তুমি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে? আর জান্নাতে প্রবেশ করবে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন কেন নয়! অবশ্যই ইহাই আমি চাই। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন-তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জি হ্যা আমার মা জীবিত আছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন- যদি তুমি তার সাথে নরম ভাষায় কথা বল, তার খাওয়া-পান করার খেয়াল রাখ, তাহলে অবশ্যই তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে; যদি তুমি কবীরা গোনাহ না কর। (আল আদাবুল মুফরাদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) একবার দুই ব্যক্তিকে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাদের একজনকে যে, দ্বিতীয় জন কে? উত্তরে সে বলল ইনি আমার পিতা। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তাকে বললেন, তুমি কখনো তার নাম নিবে না। তার সামনে চলবে না এবং কোথাও তার আগে বসবে না। (আল আদাবুল মুফরাদ)

অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে নরম কথা বল। তাদের আগে না চলা, তাদের নাম নিয়ে না ডাকা, এসব গুলো আদাবের অন্তর্ভূক্ত। পূর্বে আমরা বিস্তারিত ভাবে এর উল্লেখ করেছি।

পিতা-মাতার প্রতি আদব রক্ষায় কুরআনিক আদেশ:

পিতা-মাতার প্রতি আদব প্রদর্শন ও সম্মান রক্ষার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলার বাণী হলো وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا অর্থাৎ, এবং তাদের (পিতা-মাতার) সাথে আদবের সুরে কথা বলো ।
কথাবার্তায় তাদের সম্মান এবং নিজের অবস্থান বিবেচনা করো, কথা বলার সময় পুরোপুরি সম্মানের এবং শিষ্টাচার রক্ষা করো।

তাফসীর-এর মাঝে আছে- "তাদের সাথে শিষ্টাচার ও সম্মানের সাথে উত্তম শব্দের দ্বারা সুন্দরভাবে কথা বলো। আব্বাজি! আম্মাজি! বলে ডাকো। তাদের নাম ধরে ডাকবে না। তাদের সামনে নিজের স্বর উঁচু করো না, তাদের প্রতি তীক্ষ্ণচোখে তাকাবে না। ইবনে জারীরও ইবনে মুনজির আবু হাদ্দাদ এর এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত সাঈদ বিন মুসাইআব (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আল্লাহ তাআলা সমগ্র কুরআনে পিতা-মাতার সাথে ভালো ও উত্তম আচরণের কথা যতো জায়গায় বলেছেন, সবগুলো আয়াতের মর্ম আমার সম্পূর্ণভাবে বুঝা হয়েছে কিন্তু وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا এর অর্থ বুঝে আসে নি। এই আয়াতের কী অর্থ?

তখন হযরত ইবনে মুসাইআব (রা.) বললেন যে, তাদের সাথে এমন ভাবে কথা বলো যেমনভাবে একজন অপরাধী গোলাম তার বদমেজাজি মুনিবের সাথে কথা বলে।
হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর নিকট পিতা-মাতার ব্যাপারে قَوْلًا كَرِيمًا এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন-আম্মাজি! আব্বাজি! বলে সম্বোধন করো তাঁদের নাম ধরে ডাকবে না।"

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রহ. এই স্থানে তাফসিরে লিখেন "এই কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কথা বলার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সম্মান ও শিষ্টাচারের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের চেষ্টা করা হবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি চান যে জাহান্নাম থেকে দূরে থাকুন এবং জান্নাতে প্রবেশ করবেন? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন কেন নয়? আমি তো এমনটাই কামনা করি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন- আপনার পিতা-মাতা জীবিত? ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন হ্যা! আমার মা জীবিত। ইবনে ওমর (রা.) তখন বললেন- "যদি আপনি উনার সাথে নরম সুরে কথা-বার্তা বলেন, উনার খাবার-দাবারের খেয়াল রাখেন, তবে আপনি অবশ্যই জান্নাতে যাবেন, শর্ত হলো-আপনি কবিরাহ গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকবেন।"

তাফসীরে রুহুল বয়ান (৫/১৪৭)-এ লেখক قَوْلًا كَرِيمًا এর ব্যাখ্যায় লিখেন, "উনাদের সামনে নিজের আওয়াজ ও কথা উঁচু না করা; বরং উনাদের সাথে নরম সুরে আস্তে আস্তে কথা বলবে। কখনো কারো পিতা-মাতাকে গালি দিবে না, যার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কেউ তোমার পিতা-মাতাকে গালি দেবার সুযোগ পেয়ে যায় এবং কখনোই তাদের প্রতি রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকাবে না।" (তাফসীরে রুহুল বয়ান: ৫/১৪৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পিতা-মাতার সাথে বিনয়ের ক্ষেত্রে এমন হয়ে যাও যে, অপরাধী ও অপদস্ত, দুর্বল গোলাম যেমন ভাবে তার রুক্ষ মেজাজী মুনিবের সামনে দাঁড়ায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টিতে মাতা-পিতার সম্মান:
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক লোক উপস্থিত হয়, তার সাথে একজন বয়স্ক লোকও ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কে? সে বললো, উনি আমার পিতা। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

১. উনার আগে চলবে না।
২. উনার পূর্বে বসবে না।
৩. উনার নাম নিয়ে ডাকবে না।
৪. এবং উনাকে খারাপ কথা বলবে না।

স্বাভাবিক ভাবেই সম্মানের জন্য আবশ্যক হলো সারাজীবন পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, কিন্তু যখন তারা বয়স্ক অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সূরা বনী ইসরাঈলে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তোমাদের পিতা-মাতা বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়, যদি তাদের উভয়জন কিংবা দুজনের মাঝে কোন একজন তোমার কাছে থাকে, তাহলে তাদের উফ্ পর্যন্ত বলো না। ঝাড়ি দিয়ে কোন জবাব দিওনা। বরং তাদের সামনে ঝুঁকে থাকো এবং দু'আ করো رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا তাদের উপর রহম করো, যেভাবে তাঁরা স্নেহ ভালোবাসা দ্বারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছে।

পিতা-মাতার আনুগত্য করা

প্রত্যেক সন্তানের উপর এই যিম্মাদারী আছে যে, সে তাঁর পিতা-মাতাকে অন্তর থেকে মান্য করবে। অর্থাৎ, কখনো তাদের কথা অমান্য করবে না।
নিশ্চিতভাবে পিতা-মাতা সর্বদা সন্তানের কল্যাণ কামনা করে, এজন্য তাদের হুকুমের মাঝে কল্যাণ নিহিত থাকে। সুতরাং পিতা-মাতার আনুগত্য করা আবশ্যক। কখনো যদি জীবনে এমন অবস্থা চলে আসে যে, পিতা-মাতা কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে তবুও সে সময় চুপ

থেকে তাদের আনুগত্য করা উচিত। নিজেকে নিজে বুঝাবে এবং তাঁদের কষ্টময় ইহসানের কথা চিন্তা করে উনাদের সকল চাহিদা আনন্দচিত্তে পূরণ করবে। যদিও সে চাহিদা সন্তানের মনঃপুত না হয়। তবে শর্ত হলো, তা যেন শরীয়তের বিরোধী না হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, "ইয়ামেন-এর একজন লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ামেনে তোমার কেউ আছে? সে বললো জি হ্যা! আমার পিতা-মাতা আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা তোমাকে অনুমতি দিয়েছে? সে বললো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন- তুমি ওখানে যাও এবং তাদের কাছ থেকে অনুমতি চাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেয় তবে পুনরায় এসে জিহাদে অংশ গ্রহণ করো। অন্যথায় তাদের আনুগত্য করো এবং তাদের সেবা করতে থাকো। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।" (আবু দাউদ শরীফ)

পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে ইসলাম কি পরিমাণ গুরুত্বারোপ করেছে তা এই হাদীস দ্বারা অনুমেয়। একজন লোক কয়েক মাইল দূর থেকে এসেছে এবং সে চায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দ্বীনের ঝান্ডা উচু করার জন্য জিহাদে শরিক হবে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফেরত পাঠালেন এবং বলে দিলেন জিহাদে ঐ সময় তুমি অংশ গ্রহণ করতে পারবে যখন তোমার পিতা-মাতা তোমাকে অনুমতি দিবে। সুতরাং জানা গেল যে, পিতা-মাতার আনুগত্য করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং ইসলাম এই আদেশ দেয়। যদি পিতা-মাতার আনুগত্য করা ব্যতীত এবং তাদের অসন্তুষ্ট করে কোন ভালো কাজ করে তবুও সে নাফরমান হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পিতা-মাতার আনুগত্য করার তাওফিক দান করুন।

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডা: নিকোলাস ডিউজ এবং প্রফেসর মিলানকীম এর রিসার্চ ও গবেষণার রিপোর্ট যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে উভয়টিই প্রায় এক। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হতে থাকে তখন তাদের ভালোবাসাও বাড়তে থাকে এবং পিতা-মাতার ভালোবাসার মাঝে এক আলোর রশ্মি হয়ে সন্তানের সুস্থতা ও নিরাপদের ভিত্তি হয়। পিতা-মাতা স্বীয় সদিচ্ছার ভিত্তিতে অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে হাজার মাইল দূরে নিজের সন্তানের নিকট পৌঁছে যায়। পিতা-মাতা যদিও অসুস্থ হয় কিন্তু তাদের মাঝে অদৃশ্য শক্তি কখনোই কমে না, বরং দিন দিন তা বাড়তেই থাকে।

প্রফেসর জনাব ড. নূর আহমদ সাহেব বলেন যে, "ডাক্তার হওয়ার সুবাদে আমরা আমাদের সামনে সব রকমের মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখি। কিছু কিছু মৃত্যু আমাদের সবার জন্য একটি শিক্ষা রেখে যায়। আমি দেখছি যে-পিতা মাতার সাথে যে লোক সৎব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই দুনিয়ার অনেক সমস্যার সমাধান করে দেন। এমনকি এমন বিনাশকারী রোগ থেকে পূর্ণ সুস্থতা দান করে দেন যার কোন চিকিৎসা আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবিষ্কারই হয়নি। এবং সুখময় মৃত্যু দান করেন। প্রকারান্তরে যারা পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করে পৃথিবীতেই তারা সাজা ভোগ করে এবং খুব খারাপ ভাবে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পিতা-মাতার অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।" (সুন্নাতে নব্বী ও আধুনিক বিজ্ঞান)

পিতা-মাতার এটা একটা হক যে, সারা জীবন তাদের আনুগত্য করা হবে। আনুগত্যের উদ্দেশ্য হলো ইসলাম সমর্থিত যে কোন আদেশ করুক তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তাদের প্রত্যেক কথা মানতে হবে। শর্ত হলো, কোন কথা ঈমানের পরিপন্থী যেন না হয়। সন্তানের জন্য পিতা-মাতা উভয়ের আনুগত্য করাই আবশ্যক। কেননা তারা সন্তানকে লালন-পালন করেছে। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে সবখানে টাকা খরচ করেছে এবং সারা জীবন সন্তানের হক আদায় করেছে। এজন্য পিতা-মাতা যখনই সন্তানকে ডাকবে, তৎক্ষনিক তার উপস্থিত হওয়া উচিত।

উলামায়ে কেরাম লিখেন, এমন ৫টি আমল আছে, যার ওপর আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দরবারে এই পরিমাণ নেক লাভ হয় যেন উঁচু উঁচু পাহাড় এবং এ সকল আমলের কারণে রিযিকেও বিস্তৃতি লাভ হয়। আম্লগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

১. নিয়মিত সদকাহ করার অভ্যাস। কম হোক বা বেশি।
২. মানুষের প্রতি সহনশীল হওয়া। কম হোক কিংবা বেশি।
৩. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।
৪. সদা সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকা।
৫. পিতা-মাতার বাধ্যগত হওয়ার অভ্যাস। (ফাযায়েলে সাদাকাত)

পিতা-মাতার কাজে সহযোগীতা করা

বিখ্যাত এই বাক্য হয়তো শুনে থাকবেন- خُدِمَ خَدَمَ مَنْ অর্থাৎ, যে খেদমত করে পরবর্তীতে তাকে মানুষ তার খেদমত করে।
পিতা-মাতা ঐ সন্তানকে বেশি স্নেহ করে, যে পরিশ্রমি হয় ও পিতা-মাতার প্রতি বেশি খেয়াল রাখে। সমাজেও ঐ লোককে সবাই পছন্দ করে, যে পরিশ্রমি ও সক্রিয় হয়।
ঘরের কাজে পিতা-মাতার সাথে অংশগ্রহণ করুন। তাদের সাথে নম্রতার ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলুন। এতে আপনার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই লাভ। কেননা হাদিসে বর্ণিত আছে-নবী করীম বলেছেন ৩টি গুণ যার মাঝে পাওয়া যাবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন- ক. দূর্বল লোকের সাথে নরম সুরে কথা বলা। খ. পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করা। গ. গোলামের সাথে ভালো ব্যবহার করা। (তিরমিযী)

অতএব, এই ফযিলতের প্রতি খেয়াল করে পিতা-মাতার সাথে সীমাহীন ভালো আচরণ এবং নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করেন এবং সবধরনের কাজে তাদের সহযোগিতা করবেন। তাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গিত করে দেন। তাদের খেদমতে কখনো বিরক্ত না হওয়া। ক্লান্ত ভাব না দেখানো। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকে পানাহ চেয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলাও এই জিনিসগুলো পছন্দ করেন না।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা:
হযরত আউফ বিন মালেক (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ২জন লোকের বিচার আসলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিলেন। এই সিদ্ধান্ত যার বিরুদ্ধে ছিলো তিনি খুব মনযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করলেন এবং حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل বলতে বলতে হাঁটা শুরু করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-এই লোককে আমার নিকট নিয়ে আসো। অতঃপর বললেন হাত-পা ভেঙ্গে বসে যাওয়া আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন; বরং তোমার জন্য উচিত হলো সকল মাধ্যম গ্রহণ করা অতঃপর যদি অক্ষম হও,

7 اَلْوَكِيلُ وَنِعْمَ اللهُ حَسْبِيَ ا

অতএব, আপনিও নিজেকে এই খারাপ অভ্যাস থেকে রক্ষা করুন। এবং নিজেকে সক্রিয় করে তুলুন। আপনি নিজের জন্য একটি নিযামুল আওক্বাত গঠন করে নিন, এবং সে অনুযায়ী কাজ করুন। পাশাপাশি এই দু'আটি সব সময় পড়তে থাকুন-

وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْكَسَلِ الْعَجْزِ مِنَ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি-অক্ষমতা থেকে, ক্লান্তি থেকে, ভীতু হওয়া থেকে, কৃপণতা থেকে এবং অধিক বার্ধক্য থেকে। (আবু দাউদ)

দুরদর্শিতার সাথে কাজ করা, পিতা-মাতার কাজে সহযোগীতা করা, বলা ব্যতীতই ঘর পরিস্কারের কাজে মায়ের সহযোগীতা করা, ভালো সন্তানের বৈশিষ্ট্য। ছুটির দিনে বাবার সাইকেল, মোটর সাইকেল কিংবা যদি গাড়ী থাকে তাহলে তা ভালো করে ধৌত করে দেওয়া। বাবার জুতা পলিশ করে দেওয়া এবং এরকম অন্যান্য কাজে বাবার সহযোগীতা করা।

ঠিক তদ্রুপ ঘরের কাজসমূহে মার সহযোগীতা করা, মা কাজ করা অবস্থায় ছোট ভাই-বোন যদি কাঁদে, তাহলে তাদের শান্ত করা। যদি সে ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে বোতলে দুধ ঢেলে খাওয়ানো, মার সাথে কাপড় কাঁচা ও ধৌত করা। এমনিভাবে মার সাথে খাবার তৈরীতে সাহায্য করা। কখনো আটা দ্বারা খামিরা তৈরী করে দেওয়া, কখনো পাতিল ধৌত করা, ফ্রিজ পরিস্কার করা ইত্যাদি। বিশেষ করে বাসায় যখন মেহমান আসে তখন রান্না-বান্না, দস্তরখান বিছানো ও উঠানো সকল দায়িত্ব মায়ের ওপর যেন না হয়। বরং পুরোপুরি সহযোগীতা করা। ছোট ছোট কাজে পিতা-মাতাকে সহযোগীতা করার দ্বারা বড় বড় কাজ করা সহজ হয়ে যাবে।

স্মরণ রাখতে হবে! বিলাসিতা ও অলসতায় বিপদ ও ক্ষতি আছে। নিজের হাতে কাজ করা ও অন্যকে সাহায্য করার দ্বারা আপনার অতুলনীয় এক প্রশান্তি লাভ হবে। জীবনের শুরুতে পরিশ্রম করার মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলে মাসায়েল বুঝার জন্য এবং মুশকিল বিষয় সমাধান করার যোগ্য হয়ে উঠে। সফলতা তার পদচুম্বন করে।

নিজের ব্যক্তিত্ব ধরে রাখার জন্য কষ্ট করা, চেষ্টা করা সৃষ্টিকর্তার এক অপরিবর্তিত বিধান। যে লোক চেষ্টা ও কষ্টের মাধ্যমে উপরে উঠে তার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পৃথিবীর মাঝে ঐ লোকই অগ্রসর হয়ে যেতে পারে, যে পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের ঘোড়ায় আরোহণ করে এবং আকলে সালিম দ্বারা কাজ করে।

হোমওয়ার্কের চাপ, কোচিং পড়ার চাপ, মুতালাআ এবং তাকরারও করা লাগে। তারপরও পিতা-মাতার সাথে কাজে শরীক হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। পরিশ্রম এর দ্বারা মানুষ ক্লান্ত

হয়, অলসতা দ্বারাও ক্লান্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হুকুমে মেহনত-এর ফলাফল হয় সুস্থতা ও বিত্তশালীতা। পক্ষান্তরে অলসতার ফলাফল হলো অসুস্থতা ও দারিদ্রতা। কেননা প্রবহমান পানি পরিস্কার ও চিকচিক করে, কিন্তু জমাটবাধা পানি কালো কুচকুচে নোংরা হয়ে যায়। কিছু না করার তুলনায় কাজ করে ক্লান্ত হওয়া উত্তম। পরিশ্রমকে নিজের জন্য উপযুক্ত শক্তি মনে না করা বিধ্বংসী ভুল। মানুষের অস্তিত্ব হলো একটি যাঁতার মতো।

যার মাঝে গম পিষা হয় এবং আটা হয়। কিন্তু যদি খালি চালানো হয় তাহলে যাঁতাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সিড়ির সোপান এজন্য বানানো হয়নি যে তাতে বসে আরাম করা হবে। বরং প্রত্যেকটা সিড়ির উদ্দেশ্য হলো তার মাধ্যমে এক ধাপ উপরে যেতে পারে।

সুতরাং এক্ষুনি এই দৃঢ় সংকল্প করা যে, মেহনত, সাহসিকতা অটল-অবিচলতা এবং সক্রিয়তার মাধ্যম জীবন যাপন করবো এবং বিশেষভাবে পিতা-মাতা সহ অন্যান্য সবাইকেও উপকার করবো। যদি পিতা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হয়, তাহলে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করা। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন কাজ, যেমন- বিদ্যুৎ এর কাজ, ফ্রিজ-এয়ারকন্ডিশন মেরামতের কাজ, সেলাই এর কাজ কেউ পারে তাহলে সেটার মাধ্যমে আয় করে দেওয়া।

পিতা-মাতার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা

সন্তান সচ্ছল হলে তার উপর পিতামাতার ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত মা-বাবার খরচ না দিলে গুনাহগার হবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৫৬৪)

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদব্যবহার কর।” (সূরা ইসরা: ২৩)

অন্যত্র তিনি বলেন,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

“তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্নীয়-আপন জনের জন্যে...।” (সূরা বাকারা: ২১৫)

ইবন মুনযির রহ. বলেন,
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد

“ওলামায়ে কেরাম এব্যাপারে একমত যে, সন্তান যদি সামর্থ্যবান হয় এবং মা-বাবা যদি গরিব হয় তাহলে তাঁদের জন্য খরচ করা সন্তানের ওপর ওয়াজিব।” (আল মুগনি: ১১/৩৭৫)

আর যদি আর পিতামাতা সচ্ছল হয় কিংবা সন্তান-সন্ততি সামর্থ্যবান না হয় তাহলে মা-বাবার ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব নয়। যদিও এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো, কষ্ট হলেও যথাসাধ্য মা-বাবারও ভরণ-পোষণের খরচ চালিয়ে যাওয়া। (তাবঈনুল হাকায়েক: ৩/৬৪; রদ্দুল মুহতার: ২/৬৭৮)

কিছু বিত্তশালী সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করলো, সম্পদ থেকে কী খরচ করবো এবং কোথায় খরচ করবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আদেশ দিলেন যে, কম হোক কিংবা বেশি, যা কিছুই আল্লাহর জন্য খরচ করবে তা পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম-অভাবী এবং মুসাফিরকে দাও। কিন্তু তার মাঝে এটা খেয়াল করা আবশ্যক যে, তোমার সম্পদের মাঝে উল্লেখিত লোকদের মাঝে যে সবচেয়ে বেশি অধিকারী, সে হল তোমার পিতা-মাতা।

হাদীসে এসেছে যে, এক লোক জিজ্ঞেস করলো-হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধনবান এবং আমার বাবার অবস্থা এমন যে, তিনি আমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্বয়ং তুমি এবং তোমার সমুদয় সম্পত্তি তোমার বাবার মাল। (আবু দাউদ)

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক লোক আসলো এবং সে বললো- হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার একজন সন্তান আছে, আমার ধন সম্পদ আছে এবং অবস্থা এমন যে, আমার বাবা আমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সত্ত্বা এবং তোমার সকল সম্পদ সবই তোমার বাবার। তুমি তোমার বাবার মালিকানাধীন। বাস্তবতা হলো- তোমার সন্তান তোমার অন্যতম উপার্জন। সুতরাং স্বীয় সন্তানের উপার্জন ভক্ষণ করো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিতেন যে, নিজের পিতা-মাতার জন্য খরচ করো।

পিতা-মাতা যদি আর্থিক সংকটে থাকে, তাহলে তারা সন্তানের সম্পদ থেকে প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে। পিতা-মাতার ধন-সম্পদের ওপর যেমন সন্তানের হক থাকে ঠিক তদ্রুপ সন্তানের ধন-সম্পদের মাঝেও পিতা-মাতার হক থাকে। সম্পদ থাকা অবস্থায় কেউ যদি তার পিতা-মাতাকে প্রয়োজনের সময় খরচ না দেয় তাহলে সে গোনাহগার হবে।

সন্তানের উপার্জনের ওপর পিতা-মাতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস বর্ণিত আছে।

হযরত উমাদাহ ইবনে আমির (রা.)-এর মা হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কারো জন্য তার সন্তান তার উপার্জনের মধ্যে শামিল হবে বরং তা উত্তম উপার্জন হবে। সুতরাং তার উপার্জন থেকে খেতে পারবে। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, সন্তানও অন্যান্য উপার্জনের মতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মজলিসের নিকট দিয়ে) এমন একজন লোক যাচ্ছিলো যার শরীর ছিলো হালকা পাতলা গড়নের। তাকে দেখে উপস্থিত সবাই বললো, সম্ভবত এই শরীরটা আল্লাহর পথে অর্থাৎ জিহাদে ব্যয় করা হয়েছে। একথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হয়তো বা সে তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য পরিশ্রম করে (এবং তাদের খেদমত করায় নিযুক্ত থাকার কারণে এবং এজন্য পরিশ্রম করার কারণে এমন শুকিয়ে গেছে)। যদি এমনই হয় তবে সে আল্লাহর পথেই আছে। এরপর বললেন, হয়তো সে তার ছোট বাচ্চাদের জন্য মেহনত করে অর্থাৎ, তাদের জন্য খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে এমন হয়েছে। যদি এমন হয় তাহলেও সে আল্লাহর রাস্তায় আছে। এরপর পুনরায় বললেন, হয়তো সে নিজের জন্য পরিশ্রম করে। অর্থাৎ, নিজর জীবন যাপনের জন্য পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে, যাতে নিজেকে অন্য মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষি করে। যদি এমন হয় তাহলেও সে আল্লাহর পথে আছে। পিতা-মাতার খরচাদির জন্য পরিশ্রম করার সওয়াব।

পিতা-মাতার জন্য খরচ করার গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা সন্তানের ওপর পিতা-মাতার জন্য এই কর্তব্য আবশ্যক করে দিয়েছেন যে, সন্তান যখন উপার্জন করতে সক্ষম হবে, তখন তার জন্য আবশ্যক হলো সে তার পিতা-মাতার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে খরচ করবে। বিশেষ করে বৃদ্ধ অবস্থায় পিতা যখন উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে যাবে তখন তাকে সাহায্য করা খুবই উত্তম কাজ। পিতা-মাতার জন্য খরচ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন হে নবী! আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় কী খরচ করবো? আপনি বলে দিন তোমরা যা কিছু করচ করো এ ব্যাপারে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে এবং নেক কাজকে পূর্ণ করো নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা)

এই আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে বলা হয়। হযরত আমর বিন জুমহ (রা.) অনেক বিত্তবান ছিলেন এবং বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী খরচ করবো? এবং কোথায় খরচ করবো? তখন তার কথার জবাবে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন-এক লোক আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললো হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট একটি দিনার আছে আমি তা কী করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-নিজের জন্য খরচ করো। ঐ লোক আবার জিজ্ঞেস করলেন দুইটি থাকলে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন নিজের ঘরের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করো। আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনটি থাকলে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন নিজের খাদেমের জন্য খরচ করো। আবার জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! ৪ নম্বরে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন নিজের পিতা-মাতার জন্য খরচ করো। জিজ্ঞেস করলেন ৫ নম্বরে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন আত্মীয় স্বজনের জন্য খরচ করো। ঐ লোক পুনরায় জিজ্ঞেস করলো ৬ নম্বরে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো।

উক্ত আয়াতে কারীমার শানে নুযুলের ব্যাপারে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, সেখানে প্রশ্নকারীর পক্ষ থেকে একটি একটি করে দিরহামের হকদার জিজ্ঞেসিত হয়েছে। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো সমগ্র পৃথিবীর পালনকর্তা বড় দয়ার সাথে পিতা-মাতার নাম উল্লেখ করেছেন।

যাদের মাধ্যমে আমরা অদৃশ্য থেকে অস্তিত্বে এসেছি; যাদের রক্তের মাধ্যমে শিশু থেকে আমরা যুবক হয়েছি।

পিতা-মাতার দু'আ নেওয়া

রাতের শেষ প্রহর পৃথিবীর সবকিছু নিশ্চুপ হয়ে গেছে। হঠাৎ চৌকিদারদের আওয়াজ কর্ণকুহরে এসে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আশপাশের কোন এক ঝুপড়ী থেকে ব্যথাভরা কণ্ঠের আওয়াজ আসতে ছিলো। একজন মহিলা অস্থিরচিত্তে স্বীয় প্রভুর দরবারে হাত উঁচিয়ে দু'আ করছে-

হে আমার মালিক! দুনিয়ার সবকিছু যার কুদরতের অধীনে তিনি যাকে ইচ্ছে সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছে লাঞ্চনার জীবন দেন। হে আমির প্রভু! যার হাতে হেদায়েত এবং ভ্রষ্টতা, ইচ্ছে করলে হেদায়েত দেয় ইচ্ছে করলে ভ্রষ্টতা। আমি আপনার অপদার্থ গোনাহগার বান্দী, আপনি আমার ওপর সীমাহীন দয়া অনুগ্রহ করেছেন। কোন একটি দয়ার প্রতিদান দিতে চাইলেও তা সম্ভব না। আপনার নিয়ামতসমূহ অগণিত। ইচ্ছে করলেও তা গণনা সম্ভব না। পিতা-মাতার চেয়েও দয়ালু প্রভু! আমার একটি প্রার্থনা শোনেন। হে আল্লাহ! আমাকে ঈমানের সম্পদ দ্বারা সম্মানিত করুন। আমি ফকির ও সাহায্যহীন। আপনি ব্যতীত আমার কেউ নেই। পৃথিবীতে সব আছে স্বামী সন্তান, ভাই-বোন কিন্তু তারা কেবল দুনিয়াতেই কাজ দিবে কেয়ামতের দিন কোনই কাজে আসবে না। আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছে হলো আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো তখন যেন ঈমানের অবস্থায় মরতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনি আপনার রহমতের চাদর দ্বারা আমার গোনাহসমূহ ঢেকে নেন। গোনাগুলো মুছে দেন। দোযখের আগুন থেকে আমাকে রক্ষা করুন। হে দয়ালু মালিক! তোমার ভয়ে যে অশ্রু বিসর্জন হচ্ছে তা কবুল করে নাও। হে আমার প্রভু! কোন ধন-দৌলত আমি চাই না, কারো খেদমতও কামনা করিনা। কেবল মাত্র তোমার সন্তুষ্টিই কামনা করি। হে পৃথিবীর প্রতিপালক। আমারও সন্তান আছে। প্রত্যেক মা তার সন্তানকে জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসে। আমিও তাদেরকে রক্ত পানি করা পরিশ্রমে লালন-পালন করেছি। নিজের সুখের চেয়ে তাদের সুখকে প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু আমি তাদেরকে পৃথিবীতে আমিরের রুপে দেখতে চাই না। আমি চাইনা যে তারা দুনিয়ার হিসাবে উচ্চ স্থানে সমাসীন হোক বরং আমিতো চাই তারা নেককার হোক। তাদেরকে ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করে দেন। তারা কৃতকার্য

হয়ে সফলতার সাথে বেঁচে থাকুক। কিন্তু তা যেন কেবলই আপনার জন্য এবং আপনার দ্বীনের অনুসরণে হয়।

হে প্রভু! যখন তাদের কোন একটি আঙ্গুল সামান্য কেটে যায় তা সহ্য করতে পারি না। তাহলে তাদের আত্মচিৎকার ও রোদন আহাজারি কীভাবে সহ্য করবো? আমি এটা কিভাবে সহ্য করবো যে তারা দোযখের আগুনে জ্বলে পুড়ে আঙ্গার হচ্ছে। যখন আমি তাদের কাপড় ও চেহারায় মলিনতা দেখতে পারিনা, তাহলে তাদের বিধ্বস্ত ও চিন্তিত মুখাবয় দেখবো কীভাবে। হে দয়ালু ও মহানুভব প্রভু! আমার নিষ্পাপ এই বাচ্চাদের ওপর দয়া করেন এবং তাদেরকে নেক বান্দাদের মাঝে শামিল করে নেন। তাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ থেকে রক্ষা করুন এবং আখেরাতের শাস্তি থেকেও নিরাপদ রাখুন।

হে আল্লাহ! দুনিয়ার সকল ফেৎনা, পরীক্ষা এবং কষ্ট থেকে পানাহ কামনা করছি। আমার সন্তানদেরকে আপনি নিজের যিম্মায় রাখেন। তাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। তারা আপনার বান্দা আপনি তাদের প্রতি পিতা-মাতার থেকেও বেশি দয়ালু। আপনার এই দয়ার ওসীলা দিয়ে আমি দু'আ করছি। আমার মৃত্যুর পর তারা যেন আমার ইচ্ছা ও কামনার অবাধ্যকারী না হয়; বরং তারা যেন আমার আত্মার শান্তির মাধ্যম হয়। তাদের দেখে যেন আমার চোখ জুড়ায়। তাদের নেক কাজের দ্বারা অন্তরে যেন প্রশান্তি লাভ হয়। হে আল্লাহ! এদেরকে কেবল তোমার হাওয়ালায় সোপর্দ করলাম। তুমিই তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও পালনকর্তা। এরপর ঐ নেককার মায়ের আওয়াজ থেমে যায়।

মায়ের দু'আয় দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসা:

ইমাম বুখারি রহ. এর জীবনিতে এই ঘটনা পাওয়া যায় যে, শৈশবে ইমাম বুখারি রহ. এর চোখ দৃষ্টি হারায়। উনার মা উনার জন্য দু'আ করেন- হে আল্লাহ! আমার ছেলের চোখের দৃষ্টিক্ষমতা ফিরিয়ে দিন।

فَرَأَتْ وَالِدَتُهَا الخَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَنَاسِ فَقَالَ لَهَا : يَا هَذِهِ رَدَّ اللَّهُ عَلَى ابْنِكِ بَصَرَهُ بِكَثْرِةِ دُعَائِكِ ، قَالَ : فَأَصْبَحَ وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ

“একবার স্বপ্নে উনার মা হযরত ইবরাহিম আ.-কে দেখলেন। ইবরাহিম আ. বলছিলেন তোমার দু’আর কারণে আল্লাহ তাআলা তোমার সন্তানের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। যখন সকাল হলো দেখলেন বাস্তবেই আল্লাহ তাআলা ইমাম বুখারি রহ.-এর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন।”

যখন মায়ের দু’আ কোন সন্তানের জন্য কবুল হয়, তখন কেউ মুহাম্মদ বিন কাসিম হয়, কোন বাচ্চা সুলতান মাহমুদ গজনবী হয়, কোন বাচ্চা বায়েজিদ বোস্তামি রহ. হয়, কেউ জুনাইদ বোগদাদি হয়, কেউ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দি হয়। মার দু’আ সৌভাগ্যবান বানিয়ে দেয়। স্মরণ রাখা উচিত যে এই মা-ই একমাত্র আছে যে, কখনো হাত উঠালে তার দু’আ সোজা আরশে গিয়ে পৌছে। আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায় এবং তাঁর ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। দু’আ পরওয়ারদেগার-এর নিকট সরাসরি পৌঁছে যায়।

পিতা-মাতাকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضـ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلْ لَّكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ أَبَوَلَى قَالَ أَذِنَ لَكَ؟ قَالَ لَا ، قَالَ. ارْجِعُ إِلَيْهِمَا ، فَاسْتَأْذِنُهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدُ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا

“হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, জনৈক ইয়েমেনী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। আমার মাতা-পিতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো, না। এ সময় তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবাং উভয়ের নিকট থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো। নতুবা তাঁদের নিকট উপস্থিত থেকে সুন্দর আচরণ করতে থাকো।” (আবু দাউদ-২৫৩০)

এক ব্যক্তি মাইলের পর মাইল দূর অতিক্রম করে রাসূল (সা.)-এর নিকট এসেছিলো। আর এসেছিলোও এমন নেক নিয়ত নিয়ে যে, রাসূল (সা.)-এর সাথে থেকে দীনের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাবে। কিন্তু তিনি শুধু এ কারণে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে আসেনি এবং মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া তিনি জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজে তাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। এ হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করলে অনুভূত হয় যে, দ্বীন

ইসলাম মাতা-পিতার প্রতি কি ধরনের শ্রদ্ধাশীল এবং কেমন সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা প্রদান করে।

পিতা-মাতার আদবের প্রতি খেয়াল রাখা

মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো নিম্নে বর্ণিত আদবসমূহের মাধ্যমে তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে-

১. কখনো পিতা-মাতাকে তাদের নাম ধরে ডাকবে না; বরং তাদের ঐ উপাধির মাধ্যমে ডাকবে যা তাদের নিকট পছন্দ।

২. তাদের আগে বসবে না।

৩. তাদের আগে আগে চলবে না।

৪. প্রফুল্ল ও আনন্দিত মুখ নিয়ে কথা বলবে।

৫. উত্তম পন্থায় নসিহত করবে, যদি তারা গ্রহণ না করে তাহলে ছেড়ে দিবে।

৬. অসন্তুষ্ট হওয়া ব্যতীত তাদের কথা গ্রহণ করা।

৭. তাদের সাথে নরম সুরে কথা বলা।

৮. ক্ষুধার্থ অবস্থায় তাদের খাবার খাওয়াবে।

৯. কাপড় না থাকলে কাপড় কিনে দিবে।

১০. তাদের প্রয়োজন মতো খেদমত করবে।

১১. তাদের কথার আনুগত্য করবে; যদি তা গোনাহের কোন আদেশ না হয়।

১২. খাবার-দাবারের ব্যাপারে তাদেরকে প্রাধান্য দিবে।

১৩. তাদের জন্য রহমত ও মাগফেরাতের দু'আ করবে।

১৪. তাদের ভুলের ব্যাপারে সমালোচনা না করে নরম সুরে বুঝাবে।

১৫. তাদের সম্মান ও ইজ্জত করবে।

১৬. তাদের সামনে বড়ত্ব প্রকাশ করবে না এবং উঁচু গলায় কথা বলবে না।

১৭. এমন কাজ করবে যার দ্বারা তারা প্রশান্তি লাভ করে।

১৮. তাদের সাথে ভালো আচরণ করে তাদের দু'আ নিবে।

পিতা-মাতার সামনে কথা বলার আদব:

বড়দের সামনে আদবের সহিত থাকার মাঝে অন্যতম একটি কাজ হলো নিজের আওয়াজ ছোট রাখা। তাদের সামনে উচ্চস্বরে কথা না বলা। তাদের মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা।

তাদের সামনে কথাবলা অবস্থায় উচ্চ স্বরে কতাবার্তা বলা মারাত্মক বেয়াদবি। সর্বাবস্থায় বড়দের সামনে আদবের প্রতি খেয়াল রাখা, যদি কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে হয় তাহলে খুব সম্মানের সাথে ও নম্রভাবে মতামত দিবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের নিয়ে বসা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই পাশে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর ফারুক (রা.) বসা ছিলেন। এমন সময় হযরত আব্বাস (রা.) সামনে আসলেন তখন আবু বকর (রা.) সরে গিয়ে আব্বাস (রা.)-এর বসার জন্য জায়গা করে দিলো। অতঃপর তিনি (আব্বাস (রা.)) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাঝে বসে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে আবু বকর (রা.)-কে বললেন "সম্মানী লোকের সম্মান সম্মানী লোকই জানে।" আব্বাস (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলা শুরু করলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আওয়াজকে খুবই ক্ষীণ করে নিলেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন, মনে হলো যেন হঠাৎ করে হুজুর (সাঃ) খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। (যার কারণে হুজুর (সাঃ) তাঁর আওয়াজকে উঁচু করতে পারছিলেন না।) এই অসুস্থতার ব্যাপারে আমি মনে মনে খুব পেরেশান ছিলাম। হযরত আব্বাস (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে বসে আলাপ করছিলেন। যখন কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল পুনরায় চলে গেলেন।

অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! এখন কি আপনি কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন? হুজুর বললেন না! হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি দেখলাম আপনি আপনার আওয়াজকে খুব নরম ও নিচু করে ফেললেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হযরত জিবরাঈল আ. আমাকে আদেশ করেছেন, যখন আব্বাস (রা.) আসে আমি যেন আমার আওয়াজকে নীচু করে নেই। এ কারণে আমি আমার আওয়াজকে নিচু করেছি। যেমনিভাবে জিবরাঈল আ. তোমাকে আদেশ করেছেন আমার সামনে যেন নিচু আওয়াজে কথা বলো। (কানযুল উম্মাল)

- উল্লেখিত হাদীস দ্বারা একথা জানা গেল যে কোন মজলিসে যদি মুরুব্বী/সম্মানিত/বয়স্ক কেউ আসে তাহলে তাঁর জন্য জায়গা করে দেওয়া।
- এটাও জানা গেল যে, বড়দের সামনে গলার স্বর নিচু করতে হয়।

- কথার মাঝখানে যদি কোন কথা মনে উকি দেয় তাহলে বড় মানুষ যখন তাঁর কথা সমাপ্ত করবে, তখন জিজ্ঞেস করা। এমনিভাবে যদি পিতা-মাতা কথা বলে তাহলে তাদের কথার মাঝে কথা না বলা, আর তারা যদি আপনাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলে তাহলে তাদের কথা সম্পূর্ণ শুনে নিন।
- যদিও আপনি বুঝে যান তবুও চুপ থেকে কথা শোনা উচিত

পিতা-মাতাকে পরামর্শ দেওয়ার আদবসমূহ:
পিতা-মাতা যদি কাউকে পরামর্শদাতা বানায় তাহলে পরামর্শদাতাই থাকা উচিত। আমির না হওয়া। অর্থাৎ, পিতা-মাতা যদি কোন কাজের ব্যাপারে আপনার কাছে পরামর্শ চায় তাহলে পরামর্শ দেওয়া, আমির হয়ে আদেশ না দেওয়া। অন্যান্য ভাই-বোনের পরামর্শের ত্রুটি বর্ণনা না করা। তবে হ্যা, আপনার প্রদত্ত পরামর্শের উপকারিতা ও হেকমত অবশ্যই বর্ণনা করবেন।

পিতা-মাতাকে পরামর্শ দেওয়ার সময় নিম্নে বর্ণিত আদবসমূহের প্রতি খেয়াল রাখা:

১. নিজের পরামর্শের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা। এটাই করতে হবে। এভাবেই করতে হবে ইত্যাদি না বলা।

২. নেতৃত্ব সুলভ আচরণ না করা। বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজের মত প্রকাশ করা। উদাহরণস্বরূপ ঘর এভাবে বানালে ভালো হয়, অমুককে মালটা দিয়ে দিলে সুন্দর হবে অমুককে না দিলে ভালো হয়।

৩. নিজের মতামত প্রকাশের পর সিদ্ধান্ত পিতা-মাতার ওপর ছেড়ে দেওয়া এবং তাদের আদেশ মানার জন্য প্রস্তুত থাকা।
যেমন- কুরআনে বর্ণিত রাণী বিলকিছের ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম- যখন রাণী বিলকিছ হযরত সুলাইমান আ. এর চিঠি পেলেন, তখন তিনি তাঁর সভাসদ সবাইকে ডাকলেন এবং পরামর্শ আহ্বান করলেন। তখন সভার সদস্যবৃন্দ পরামর্শ দিলো আমরা শক্তিশালী এবং আমাদের পর্যাপ্ত যোদ্ধা আছে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও বললো-শেষ সিদ্ধান্তের অধিকার তো কেবলই আপনার। (সূরা নামল)

সুতরাং আপনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন তা বাস্তবায়ন করতে আমরা প্রস্তুত। অতএব আমাদের জন্যও উচিত হলো মতামত দেবার পর পিতা-মাতার সব সিদ্ধান্ত মানার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা, যদি তা শরীয়ত বিরোধী না হয়।

৪. পিতা-মাতা যতক্ষণ আপনার কাছে মতামত না চায়, ততোক্ষণ চুপ থাকা। নিজ থেকে মতামত প্রকাশ না করা।

৫. অন্যান্য ভাই-বোন যখন তাদের মতামত ব্যক্ত করবে, তখন তাদের মতামত মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করা, তাদের কথার মাঝখানে কোন কথা না বলা এবং তাদের মতামতের ব্যাপারে এ ধরনের সিদ্ধান্তসুলভ কথা না বলা যে, এটা সম্ভব নয়। এটা হতে পারে না, বরং কর্তব্য হলো মনযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনে পরে নিজের মতামত প্রকাশ করা।

৬. আল্লাহ না করুন! মশোয়ারা গ্রহণের পর যদি কোন বিপদ বা খারাপ কিছু সংঘটিত হয় তাহলে এ জাতীয় কথা না বলা যে-আমি আগেই বলেছিলাম "আমার কথা শোনেন নি, তাই এমন হলো" যদি আমার কথা শোনতেন তাহলে এমন হতো না ইত্যাদি।

কেননা, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ - অর্থাৎ, যদি শব্দটি শয়তানের দরজা খুলে দেয়; বরং বলবে- قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ -অর্থাৎ, যা কিছু আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছিলেন তাই হয়েছে। এর মাঝেই কল্যাণ। (মুসলিম)

পিতা-মাতার নাম আলোকিত করা

পিতা-মাতার নাম কীভাবে আলোকিত করবো। আপনি কিতাব/বই বন্ধ করে ২ রাকাত নফল নামায পড়ে এবং দু'আ করা। হে আল্লাহ! আমাকে পিতা-মাতার চোখের শীতলতাদানকারী বানিয়ে দিন। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের নাম আলোকিত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

১. সর্ব প্রথম কথা হলো, যার মাধ্যমে আপনি পিতা-মাতার নাম আলোকিত করবেন, তা হলো আপনি পবিত্র কুরআনের হাফেজ হয়ে যান। এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে লোক কুরআন পড়ে এবং তদানুযায়ী আমল করে কেয়ামতের দিন তার পিতা-মাতার মাথায় একটি মুকুট পরিধান করানো হবে। যার আলো

সূর্য থেকেও বেশি হবে যদি ঐ সূর্য তোমাদের ঘরে থাকে, তাহলে ঐ লোকের ব্যাপারে কী ভাববে যে নিজে কুরআনের ওপর আমলকারী। (আবু দাউদ)

এটা কতো বড় ফযিলত এবং সৌভাগ্য যে সামান্য কষ্ট ও মেহনতের ফলে কতো বিশাল প্রতিদান ও সওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করেন। আপনার কুরআন হেফয করার কারণে যখন কেয়ামতের দিন পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ একত্রিত হবে, সকলের সামনে আপনার পিতা-মাতাকে এমন আলোকময় মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্য থেকেও বেশি উজ্জল হবে।

সকল নবীগণ, শহীদগণ, সত্যবাদীগণ, সৎলোকেরা সেখানে থাকবে, হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে পৃথিবীর সর্ব শেষ মানুষটা পর্যন্ত সকলেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে যে-অমুকের ছেলে কুরআনে পাক হেফয করার কারণে তাঁর পিতা-মাতাকে এমন দামি ও মূল্যবান মুকুট পরিধান করানো হচ্ছে। এটা কত বড় সম্মানের কথা যে, আপনার কারণে কেয়ামতের দিন সবার সামনে এভাবে আপনার পিতা-মাতার নাম আলোকিত হবে এবং পৃথিবীতেও মানুষ এ ধরনের মানুষকে খুব সম্মান করে ও ঈর্ষা করে।

সুতরাং সাহস করে এবং কুরআন হিফয করা শুরু করতে হবে। যদি প্রতিদিন ১০ আয়াত মুখস্থ করা হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ ১ বছর ১০ মাস ৭দিনে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা যায় (মাসে ৩০ দিন হিসাব করে)।
আর যদি দৈনন্দিন ১৫ আয়াত করে মুখস্ত করা হয় তাহলে (প্রতি মাসে ৩০ দিনের হিসাবে) সহজেই ১ বছর ২ মাস ২৫ দিনে পুরো কুরআন শরীফ হিফজ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।
কেউ যদি এমন বয়সে উপনীত হন যে, কোন কিছু স্মরণ থাকে না। তবুও চেষ্টা করা। এর পাশাপাশি নিজের সন্তান সন্ততি, ভাই-বোন এর সন্তান, খাদেম, চৌকিদার, ঘরের পরিচ্ছন্ন কর্মীর ছেলে-মেয়ে সবাইকে উৎসাহ প্রদান করে হাফেজ বানিয়ে দিন।
নিজের এলাকায় কুরআনে কারীম মুখস্থ করানোর জন্য শিক্ষক রেখে হিফজ শুরু করা। যাতে কমপক্ষে এই সওয়াবটুকু অর্জন করতে পারা এবং আখেরাতে তাদের সাথে নিজের নামও লিখা হয়, যারা তাদের পিতা-মাতার নাম আলোকময় করেছে।

২. পিতার মাঝে আল্লাহ তাআলা যে সকল ভালো গুণ দান করেছে, তিনি যে সকল ভালো কাজ করছেন বা করেছেন, ঐ সব কাজ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশেষ করে চাচা-কাকা, ফুফী, দাদা-দাদী এর সাথে ভালো আচরণ করা তাদের সাথে নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে

কথা বলা। তাদেরকে সম্মান করা। তাদের সন্তানদের প্রতিও খেয়াল রাখা। তাদেরকে বিভিন্ন হাদিয়া উপহার উপঢৌকন দেওয়া। তাদের নিষ্কর্ম সন্তানদেরকে কাজে লাগানো। কমপক্ষে সপ্তাহে একবার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা। এই সকল কাজের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা।

৩. আল্লাহ তাআলা যে সম্পদ দান করেছেন, পিতা-মাতার ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে দিন, কূপ খনন করে দিন। অথবা হাসপাতাল নির্মাণ করা। বাচ্চাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা।

তবে হ্যাঁ! এটা আবশ্যক না যে, পিতার নামে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। অথবা তাঁর নামে মসজিদের নামকরণ করতে হবে। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ করছেন, তিনি জানাই যথেষ্ট। ঢাক ঢোল পিটিয়ে পৃথিবী বাসীকে জানানোর প্রয়োজন নেই। কোথাও কোন চিহ্নও যদি না থাকে কেবল রব জানলেই যথেষ্ট হবে। প্রকৃত পক্ষে ঐ সাদাকার মাঝেই বেশি সওয়াব যা গোপনে করা হয়। যে লোক গোপনে সাদাকাহ/দান করে তার ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত আছে। "এবং ঐ লোক যে এমন গোপনীতার সাথে সাদাকাহ করে যে তার বাম হাত জানেনা ডান হাত কি করেছে।" (বুখারী)

এটা একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশ বিশেষ। হাদিসের প্রথমাংশে ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন ৭ প্রকারের মানুষকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ঐ ৭ প্রকার লোকের মাঝে একজন ঐ লোক, যে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানে না যে ডান হাত কি খরচ করলো।

অতএব, সম্পদ এভাবেই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা এবং বিনিময়ে সৃষ্টিজীবের কাছে কিছুই না চাওয়া। শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। কেননা আল্লাহ তাআলা তো আপনার অন্তরের অন্তঃস্থলের খবর জানার সক্ষমতা রাখেন। তিনি সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত।

পিতা-মাতার চোখের শীতলতা দানকারী হয়ে যাওয়া

আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত নবীগণ তাঁদের সন্তানদের জন্য যে দু'আ করেছেন ঐ সকল গুণাবলি গ্রহণ করে আপনি আপনার পিতা-মাতার চোখের শীতলতা দানকারী হতে পারেন। সন্তান যখন ভালো হয়, ঐ সন্তান বাস্তবিকপক্ষেই পিতা-মাতার জন্য প্রশান্তিদায়ক হয়। এমন সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার মন থেকে এমনিতেই দু'আ চলে আসে। এটা সন্তান ও পিতা-মাতা উভয়ের জন্য উভয় জগতের অনেক বড় ১টি নিয়ামত।

এই নিয়ামত আপনিও অর্জন করতে পারেন। আপনি যদি সত্যিকারের আগ্রহ ও একনিষ্ঠতার সাথে ঐ সকল কথার উপর আমল করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আপনাকেও এই নিয়ামত দান করবেন-

১. ঐ কথাসমূহের মাঝে সর্বপ্রথম কথা হলো, শিরক থেকে বাঁচা। খুলিলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ. তার সন্তানের জন্য এই দু'আ করেন-رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ অর্থাৎ, হে প্রভু! এই শহরকে নিরাপদ করে দিন। আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে খারাপ পরিণাম থেকে হেফাজত করুন। [সূরা ইবরাহিম]

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ বলেন-প্রত্যেক কল্যাণকামীর উচিত তার নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য এবং সন্তান-সন্ততির জন্য এই দু'আ করা। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

২. যে সকল গুণ গ্রহণ করার দ্বারা আপনি পিতা-মাতার জন্য প্রশান্তিদায়ক হতে পারেন তার ২নং সিফত হলো-নামায। নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদিসে যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন অন্য কোন কিছুর ব্যাপারে এই পরিমাণ গুরুত্ব দেননি।

আল্লাহ তাআলার বাণী- সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও, নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (সূরা বনী ইসরাইল) এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ অর্থাৎ নামায দ্বীনের স্তম্ভ।

আপনি সামান্য ভাবুন-নামায দ্বীনের মাঝে কতোটা গুরুত্ব রাখে। অসংখ্য আয়াত ও হাদিসের মাঝে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী লোক অর্থাৎ, নবীগণ শিরিক থেকে হেফাজতের ব্যাপারে দু'আ করার পর সন্তানের ব্যাপারে যে জিনিসের দু'আ করতেন তা হলো নামায।

৩. তৃতীয় গুণ হলো- খেদমত। খেদমত হলো এমন বিষয় যার দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য। আমরা সবাই জানি যে, সন্তানের ওপর পিতা-মাতার কি পরিমাণ দয়া থাকে। সন্তানেরা যদি সারা জীবন তাদের খেদমত করে তবুও তাদের হক আদায় হবে না। জেনে রাখুন! যে লোক পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করে, তাদের খেদমত করে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করে, তার বদলায় আল্লাহ তাআলা ঐ লোকের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

সব সন্তানই পিতা-মাতার জন্য চোখের শীতলতা দানকারী হতে পারে। আপনি আপনার পিতা-মাতার খেদমতে কখনো পিছপা হবেন না। যে খেদমতই হোক না কেন, সন্তুষ্টচিত্তে তা করে দিন, কখনো পা টিপে দিন। কখনো মাথায় তেল মালিশ করে দিন। কখনো পান বানিয়ে দিন, কখনো জুতা ঠিক করে দিন।

এ জাতীয় ছোট-খাটো খেদমতের দ্বারা অন্তরে এমন প্রশান্তি লাভ হয়। ফলে পিতা-মাতার মন থেকে আপনা-আপনিই দু'আ চলে আসে। এবং সন্তানের জন্য উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করে। এরূপ ছোট ছোট খেদমত ও নেক মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছায়, যা তারা ভাবতেও পারে না। খেদমত হলো এমন একটি গুণ, যা মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর সকল সৃষ্টিজীবের কাছে প্রিয় করে তুলে। আমাদের আকবিরগণ! যারা আমাদের গর্ব। উনারা ইলমের দিক থেকে রথি-মহারথি ছিলেন তদ্রুপ খেদমতের দিক থেকে ও পিছিয়ে থাকতেন না।

পিতা-মাতার সাথে নেক আচরণ করা ও পিতা-মাতার জন্য কল্যাণকামী হওয়া

পিতা-মাতার সাথে ভালো কিছু করার মাঝে একটি এমন বিষয় আছে যা নারী-পুরুষ ধনী-গরিব, দূর্বল শক্তিশালি সবাই করতে সক্ষম। তা হলো জীবিত বা মৃত পিতা-মাতার জন্য দু'আ করা। আর এই আদেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফে দিয়েছেন-

صَغِيرًا رَبَّيَانِي كَمَا ارْحَمْهُمَا رَبِّ وَقُلْ

"এবং বলুন! হে পালনকর্তা! আমার পিতা-মাতার ওপর রহমত অবতীর্ণ করুন। যেমনি ভাবে তারা শৈশবকালে আমাকে করেছে।" (সূরা ইসরা: ২৪)

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنًا بَيْتِيَ دَخَلَ وَلِمَنْ وَلِوَالِدَيَّ لِي اغْفِرْ رَبِّ

“হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে-তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন।” (সূরা নূহ: ২৮)

مِنْهُ تَبَرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تَبَيَّنَ فَلَمَّا إِيَّاهُ وَعَدَهَا مَوْعِدَةٍ عَنْ إِلَّا لِأَبِيْهِ إِبْرَاهِيمَ اسْتِغْفَارُ كَانَ وَمَا حَلِيمٌ لَأَوَّاهُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ

“আর ইবরাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিলো কেবলই সেই প্রতিশ্রুতির কারণে যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইবরাহিম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়ী ও সহনশীল।” (সূরা তাওবা: ১১৪)

এবং হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-যখন মানুষ মারা যায়, তিনটি জিনিস ব্যতীত বাকি সব আমল শেষ হয়ে যায়। তিনটি জিনিস হলো- ১. সদকায়ে জারিয়াহ। ২. ঐ এলেম যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। ৩. ঐ নেক সন্তান যে পিতা-মাতার জন্য দু’আ করে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একে অপরের জন্য দু’আ করতে বলেছেন। পিতা-মাতাকে সন্তানের জন্য দু’আ করতে আদেশ দিয়েছেন। সন্তানকে পিতা-মাতার জন্য দু’আ করার আদেশ দিয়েছেন। এবং দু’আ কবুল করার ওয়াদাও দিয়েছেন। যে লোক এমনটা করবে, সে অনেক বড় ফযিলত লাভ করবে। তাঁরা কখনো শূন্য হাতে ফিরে না। আল্লাহ তাআলা ঐ সকল লোকদের প্রশংসা করেন যারা নিচের দু’আটি সর্বদা পাঠ করেন-

إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنَا أَعْيُنٍ قُرَّةَ وَذُرِّيَّاتِنَا أَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এমন স্ত্রী এবং সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ বানাও।” (সূরা ফুরকান: ৭৪)

بِالْإِيْمَانِ سَبَقُوْنَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং যারা আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে গত হয়েছে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন।” (সূরা হাশর: ১০)

কুরআনে কারীমে নবীগণের বিভিন্ন ভালো দিক ও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে অভিভাবক হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় হযরত ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিযা আ.-এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

عَصِيًّا جَبَّارًا يَكُنْ وَلَمْ بِوَالِدَيْهِ وَبَرًّا ، تَقِيًّا وَكَانَ وَزَكَاةً لَدُنَا مِنْ وَحَنَانًا

“আমি তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে স্নেহ-মমতা ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহেযগার এবং পিতা-মাতার অনুগত। সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না।” (সূরা মারইয়াম: ১৩-১৪)

হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আ. বলেন,

شَقِيًّا جَبَّارًا يَجْعَلْنِي وَلَمْ بِوَالِدَتِي وَبَرًّا ، حَيًّا دُمْتُ مَا وَالزَّكَاةِ بِالصَّلَاةِ وَأَوْصَانِي

“তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। জননীর অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি।” (সূরা মারইয়াম: ৩১-৩২)

উত্তম হলো, ছেলে তার বাবাকে এবং বাবা তার ছেলেকে দু’আ শুনিয়ে দিবে। অর্থাৎ, এমন দু’আ করবে যাতে পরস্পরে একে অন্যের জন্য দু’আয় মগ্ন হয়। সন্তান যখন তার বাবার আনুগত্যের প্রতি অধিক মনোযোগী হয় তখন বাবাও খুশি থাকে এবং সন্তানের ওপর আরও দয়ালু হয়। অনেক বুযুর্গ লোকগণ খুব অধিক পরিমানে এই দু’আ করতেন হে আল্লাহ! আমার সন্তানের মাঝে বরকত দান করুন। তাকে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত করবেন না। তাকে আমার আনুগত্য ও আমার সাথে ভালো আচরণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরে করণীয়

এই পৃথিবীতে মাতা-পিতা চিরদিন কারো বেঁচে থাকে না, সবার মতো তাদেরও চিরদিনের জন্য চলে যেতে হয়, না ফেরার দেশে। আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার জাল ছিন্ন করে। এটাই তো চিরন্তন বিধান। এটা সবাইকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরও সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক থেকে যায়। এজন্যই তো আল্লাহপাক নির্দেশ করেছেন, মাতা-পিতার জীবদ্দশায়ই তাদের সেবা যত্ন করে ক্ষান্ত হবে না; বরং তাদের এন্তেকালের পরও তাদের জন্য দু'আ করবে। আর কোন ভাষায় দু'আ করলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সন্তানের হক আদায়েও ত্রুটি হবে না, সে ভাষাতো সন্তানের জানা নেই, তাই রাব্বুল আলামীন আপন দয়ায় তা

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থাৎ তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার শৈশবকালে যখন আমি ছিলাম অসহায়, অক্ষম তখন তারা যেভাবে আমাকে লালন পালন করেছেন, যেভাবে তারা আমার সুখ শান্তির জন্য নিজেদের আরামকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং আমার প্রতি সর্বক্ষণ দয়ামায়া করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর, রহমত কর, তোমার অনন্ত অসীম করুণার কোলে তাদেরকে আশ্রয় দাও, তাদেরকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্যমণ্ডিত কর। মাতা-পিতা জীবিতাবস্থায় অনেক লোকের সাথে প্রতিশ্রুতি করে থাকতে পারেন। বিভিন্ন ব্যাপারে কিছু প্রতিশ্রুতি করতে পারেন। মৃত্যুর সময় কিছু ওসিয়ত করে যেতে পারেন।

পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরে সন্তানদের কিছু করনীয় নিচে তুলে ধরা হলো:

পিতা-মাতার জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা

মানবজীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো এই যে, সে ক্ষমা পেয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইস্তেগফার। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার ৩টি অবস্থা-

১. নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

২. অন্যান্য মোমিন ভাইদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চাইবে।

৩. যে সকল মুসলমান পরপারে গমন করেছে আত্মীয় হোক বা না হোক সবার জন্য মাগফেরাত-এর দু'আ করা।

মানব জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা হলো সে যেন ক্ষমা পেয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের সব রকমের গোনাহ ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইস্তেগফার।

মুসলমানদের জন্য দু'আ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণী-
"এবং ঐ সকল লোক, যারা পরবর্তীতে আগমন করেছে তারা বলে- হে আমাদের প্রভু! আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের ঐ সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিন যারা পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছিলো এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের জন্য ঈর্ষা রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান।" (সূরা হাশর)

হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনগণকে ক্ষমা করে দিন। যেদিন হিসাব করা হবে। (সূরা ইবরাহিম)

নিজের জন্য ব্যতীত অন্য মুসলিম নারী পুরুষের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-
হযরত উবাদাহ ইবনে সাবেত রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, যে লোক মুমিন নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর হিসাবে ১টি করে সওয়াব দান করেন। (তাবরানী)

যখন পিতা-মাতা পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তখন তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে মাগফেরাতের দু'আ করা এবং তাদের আমল নামায় ঈসালে সওয়াব প্রেরণ করা। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী-
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- কবরে মৃত লোকের অবস্থা পানিতে ডুবতে থাকা চিৎকারকারী লোকের মতো। তারা দু'আর অপেক্ষায় থাকে। চাই সে দু'আ পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হোক বা সন্তানের পক্ষ থেকে হোক কিংবা বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে হোক। যখন এই দু'আ মৃতের নিকট পৌছানো হয় তখন তা মৃতের নিকট পৃথিবীর সবকিছু থেকে প্রিয় হয়। আল্লাহ তাআলা পৃথিবী বাসীদের দু'আকে পাহাড়সম বৃদ্ধি করে মৃত লোকের নিকট তা পৌছায়। জীবিত লোকদের পক্ষ থেকে মৃত লোকদের জন্য উপহার হলো-তাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করা। (বায়হাকি)

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হলো যে মৃত লোকদের জন্য ক্ষমার দু'আ করা। কেননা এর দ্বারা কবর জগতে তারা শান্তি লাভ করে। যদি কোন মৃত শাস্তির আওতায় থাকে তাহলে তার মাঝে শীথিলতা আসে আর যদি জান্নাতে থাকে তাহলে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় ।

এমনিভাবে অন্য হাদিসে মৃত পিতা-মাতার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং যদি কারো পিতা-মাতা দুনিয়া থেকে চলে যায় এমতাবস্থায় তাদের সন্তান তাদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করে তাহলে কবরে তাদের জন্য অনেক উপকার হয়। এ ব্যাপার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী-
"হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সন্তান অবাধ্য থাকাবস্থায় যদি কারো বাবা-মা দুজন কিংবা যে কোন একজন ইন্তেকাল করে আর সন্তান তাদের জন্য দু'আ ইস্তেগফার পাঠ করে তাহলে শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাকে নেক সন্তানদের মাঝে গণ্য করবেন।" (বায়হাকি)

যখন পিতা-মাতা পৃথিবী থেকে চলে যান, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাত এর দু'আ করা। যে দু'আর মাধ্যমে তাদের শান্তি লাভ হয়। এই ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
কবরে মৃত মানুষের অবস্থা হলো ডুবতে থাকা অবস্থায় চিৎকারকারী মানুষেরর মতো তারা দু'আর অপেক্ষায় থাকে। চাই সে দু'আ পিতা-মাতার বা ভাই-বোন কিংবা বন্ধুবান্ধবের পক্ষ থেকে হোক। এবং সে দু'আ যখন মৃতের নিকট পৌঁছায় তখন সে তা পৃথিবীর সবকিছু থেকে বেশি প্রিয় মনে করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীর দু'আতে পাহাড় সমান বৃদ্ধি করে তা মৃতের নিকট পৌছান এবং জীবিত লোকের পক্ষ থেকে মৃত্যুর জন্য উপহার হলো সে মৃত্যুর জন্য মাগফেরাত এর দু'আ করবে। (বায়হাকী)

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, মৃতদের জন্য ইস্তেগফার এর দু'আ করা উচিত। কেননা এই দু'আর মাধ্যমে তারা কবর জগতে শান্তি লাভ করে। যদি কোন কবরবাসীর ওপর শান্তি চলে, তাহলে শাস্তি ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ভালো হয় তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

পিতা-মাতার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করার দ্বারা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়:
হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ভালো মানুষদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করবে হে প্রভু! আমাকে এই সম্মান কেন দান

করা হয়েছে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করেছে, এটা তারই প্রতিদান।

এ দ্বারা বোঝা গেলো যে, পিতা-মাতার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করা অনেক ভাল আচরণ। যা মৃত্যুর পরও চলমান থাকবে। কমপক্ষে প্রত্যেক ফরয নামাজের পর পিতা-মাতার জন্য দু'আ করা উচিত। এতে কোন খরচ হয় না কিন্তু তাদের খুব উপকার হয়।

মৃত পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণের পদ্ধতি:

১. পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণের মাঝে ১টি হলো তাদের মৃত্যুর পর সন্তান তাদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করবে। (বুখারী শরিফ)

২. যে লোক তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে অথবা তাদের ঋণ পরিশোধ করবে সে কেয়ামতের দিন নেককারদের সাথে উঠবে। (ত্ববরানি ও দারেকুতনি)

৩. যে তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে, তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে এবং ১০ হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

৪. এক হাদিসে বর্ণিত আছে, যে লোক তার পিতা-মাতার কারো পক্ষ থেকে হজ্জ করে তাহলে তাদের জন্য ১ হজ্জের সাওয়াব হয় এবং হজ্জ আদায়কারী ৯ হজের সওয়াব পায়। (ফাযায়েলে সদকাহ)

৫. যে লোক তার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব করে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং পিতা-মাতার জন্য পুরো হজ্বের সওয়াব লিখেন। তার সওয়াবের মাঝে কোন কমতি হয় না। (বায়হাকি)

৬. এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো পিতা-মাতা জীবিত অবস্থায় তো তাদের খেদমত করতে পারি। তাদের মৃত্যুর পর কীভাবে করবো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন-এটাও তাদের খেদমত যে, তাদের মৃত্যুর পর নিজের নামাজের সাথে তাদের জন্যও নামায পড়বে এবং নিজের রোযার সাথে তাদের জন্যও রোযা রাখবে। (দারে কুতনি)

৭. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-যখন কেউ পিতা-মাতার জন্য দু'আ ছেড়ে দেয়, তার রিযিক কেটে দেওয়া হয়। (ইসলামে পিতা-মাতার স্থান)

৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের মাঝে কেউ কোন কিছু নফল খায়রাত করে তার জন্য উচিত হলো নিজের পিতা-মাতার জন্য খায়রাত করবে। তাহলে পিতা-মাতা এর দ্বারা সওয়াব পাবে এবং সে নিজেও সওয়াব পাবে ও তার মাঝে কোন কমতি হবে না। (দারেকুতনী)

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে লোক তার পিতা-মাতার কবরে জুমআর রাত্রিতে যিয়ারত করার জন্য আসবে আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণকারী হিসাবে গণ্য করবে। এর দ্বারা এটা বুঝবে না যে-আসো জীবনে যতো খুশি পিতা-মাতার নাফরমানি করে নেই। তাদের মৃত্যুর পর কবর যিয়ারত করে শুধুমাত্র অবাধ্যতার গোনাহ না, অন্যান্য সব গোনাহও মাফ করিয়ে নেব। আরে ভাই এর কী নিশ্চয়তা? এমনও তো হতে পারে পিতা-মাতার পূর্বেই আপনি মৃত্যুবরণ করতে পারেন এবং মা বাবার কবরে যাবারই সুযোগ পেলেন না। দ্বিতীয় কথা হলো কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এবং আল্লাহ তাআলা হৃদয়ের গোপন ইচ্ছে পর্যন্ত জানেন।

১০. যে লোক পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের বাধ্য ছিলো, কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের ব্যাপারে ভালো মন্দ বলে কিংবা তাদের ঋণ পরিশোধ না করে, তাদের জন্য ইস্তেগফার না পড়ে, তাহলে অবাধ্য হিসাবে গণ্য করা হবে। এর দ্বারা বুঝা গেলো মৃত্যুর পর পিতা-মাতাকে ভালো-মন্দ বলা যাবে না। যদি কোন ঋণ রেখে যায় তা আদায় করবে এবং তাদের জন্য ইস্তেগফার পাঠ করবে।

১১. নিজের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, বোন-ভাই, সন্তানাদি এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বিশেষ করে ঐ সকল লোক মৃত্যুর পর যাদের কোন জিনিস আপনার নিকট পৌছায় কিংবা তার বিশেষ কোন দয়া আপনার ওপর রয়েছে, যেমন-উস্তাদগণ; তাদের জন্য ঈসালে সওয়াব করার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা চাই।

১২. উত্তম আচরণ হলো, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিচিত জনের সাথে ভালো আচরণ করা। (মুসলিম শরিফ)

১৩. যে লোক চায় যে, তার বাবার সাথে কবর দেশে ভালো আচরণ করা হোক, তাহলে সে যেন পিতা-মাতার বন্ধু বান্ধবের সাথে ভালো আচরণ করে।

১৪. নিজের পিতার বন্ধুদের প্রতি খেয়াল রেখে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করা। (বুখারী)

১৫. হাদিসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলা আছে যে, পিতার অনুমতি বা ওসিয়ত থাকুক না থাকুক তার মৃত্যুর পর বদলি হজ্জ করতে পারবে।

পিতা-মাতার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করা

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর বা ভালো আচরণের একটি পন্থা অবশিষ্ট থাকে। তাহলো তাঁদের কৃত প্রতিশ্রুতি ও অসিয়তসমূহ পূর্ণ করা। আর এভাবেই তাঁদের রূহকে আনন্দদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তবে তাঁদের জায়েয বা বৈধ

ওসীয়তই পূরণ করতে হবে। যদি তাঁদের অবৈধ ওসীয়তও পূরণ করা হয়, তাহলে এটা তাঁদের সাথে ভালো আচরণ হবে না বরং অন্যায় আচরণ হবে। তারা যদি কারোর সাথে আর্থিকভাবে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন অথবা কাউকে কিছু দান করতে চেয়ে থাকেন। আর জীবনে যদি তার সুযোগ না পান অথবা তাঁরা কোনো মান্নত করেছিলেন, কিন্তু তা পূরণের আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অথবা তিনি ঋণী ছিলেন কিন্তু ওসীয়ত করার সুযোগ পাননি, অথচ আপনি বুঝেন যে, সুযোগ পেলে তিনি অবশ্যই এ ওসীয়ত করতেন অথবা তিনি কোনো ওসীয়ত করেননি। আপনি যদি তাঁদের পক্ষ থেকে সদকাহ করেন তাহলে এসবই তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে। আর এভাবেই তাঁদের মৃত্যুর পরও আপনি জীবনভর তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়ত করে যাননি, আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকাহ করি, তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন নয়। অবশ্যই উপকারে আসবে। আব্দুল্লাহ রাযি বর্ণনা করেন, আসআদ ইবনে উবাদাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মান্নত করেছিলেন। কিন্তু এ মান্নত আদায়ের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মান্নত পুরা করতে পারি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, কেন নয়। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মান্নত পুরা করে দাও।

পিতা-মাতার অনাদায়ী ঋণ আদায় করা

মৃত-পিতা-মাতার যদি অনাদায়ী কোনো ঋণ থাকে, তাহলে সাধ্যমত তা আদায়ের ব্যবস্থা করা। ঋণের কারণে মানুষের আমল ঝুলন্ত থাকে, কবূল হয় না, তার আত্মার শান্তির ফয়সালা মওকুফ হয়ে থাকে। তাই মাতা-পিতার যে কোনো রকম ঋণ থাকুক, মানুষের ঋণ হোক, বা আল্লাহর ঋণ হোক সব ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে।

যদি মাতাপিতা ঋণ রেখে মারা যায় এবং পরিশোধযোগ্য সম্পদও রেখে যায়, তাহলে ঐ ঋণ পরিশোধ করা ফরয কর্তব্য, যদিও উত্তরাধিকারীদের জন্য এক পয়সাও উদ্বৃত্ত না থাকে। সে

অসিয়ত করুক অথবা না করুক। আর যদি ঋণ পরিশোধের অসিয়ত করে থাকে, তাহলে তো ফরযের মধ্যে আরও মাত্রা বৃদ্ধি পেল। মাতাপিতা যদি সম্পদ না রেখে যায়, তাহলেও মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া উচিত। এটা অনেক বড় সদ্ব্যবহার, কেননা, এর দ্বারা তাঁদেরকে আখেরাতের ধর-পাকড় থেকে মুক্ত করা হবে; বরং তাঁদের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া তাঁদের জন্য সদকা করার চেয়ে উত্তম। হযরত ইমাম আওযায়ী রহ. বলেছেন, আমার নিকট বিশ্বস্তসূত্রে এই মর্মে রেওয়ায়ত পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়, অতঃপর তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয়- যা তাঁদের জিম্মায় ছিল এবং তাঁদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করে; অধিকন্তু তাঁদের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে কাউকে গালি দেয় না, তাহলে তাকে পিতামাতার বাধ্যগত ও নেক সন্তান হিসেবে লিখে দেওয়া হয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে অতঃপর তাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁদের ঋণ পরিশোধ করে না, তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না এবং তাঁদের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে গালি দেয়, এমন সন্তানকে পিতামাতার অবাধ্য সন্তান হিসেবে লিখে দেওয়া হয়। (দুররে মানসূর)

আল্লাহর ঋণ তথা আল্লাহর হক বাকি থাকলে তা দেওয়ার অর্থ হল তাদের নামায অনাদায়ী থাকলে হিসাব করে তার ফিদইয়া দেওয়া। ফিদইয়া হলো একেক ওয়াক্ত অনাদায়ী নামাযের জন্য সদকায়ে ফিতর পরিমাণ টাকা গরীব মিসকীন বা কোনো অসহায় মানুষকে দান করে দেওয়া। এমনিভাবে কোনো রোযা অনাদায়ী থাকলেও একেকটি রোজার জন্যও সদকায়ে ফিতর পরিমাণ টাকা দান করে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ তার যদি ১০০ ওয়াক্ত নামায কাযা থাকে আর ২০টি রোযা না রেখে থাকে তাহলে ঐ মরহুমের জন্য ১২০টি সদকায়ে ফিতর পরিমাণ টাকা হিসাব করে দান করে দিবে। একটি সদকায়ে ফিতর যদি হয় ৫০ টাকা তাহলে তার জন্য ১২০×৫০ = ৬০০০/- ছয় হাজার টাকা দান করে দিতে হবে। হজ অনাদায়ী থাকলে বদলী হজ করানোর ব্যবস্থা করা, যাকাত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করা ইত্যাদি। সন্তানের যদি সাধ্য থাকে তাহলে এগুলো করা দ্বারাও মৃত পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করা যায়।
মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ঋণ অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে ঋণ হচ্ছে মানুষের হক (হক্কুল ইবাদ), যা শুধু মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় না। বরং মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে সর্বপ্রথম তাঁর ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। ওয়ারিশদের দায়িত্ব হলো, সাধ্যমতো দ্রুত সেই ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা।

হাদীসে এ বিষয়ে কঠোর সতর্কতা এসেছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“ঈমানদার ব্যক্তির রূহ তার ঋণের সঙ্গে বন্ধক থাকে, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।” (জামে’ আত-তিরমিজি: ১০৭৯)

তবে এর অর্থ এই নয় যে, ঋণ বড় হওয়ার কারণে যদি ওয়ারিশরা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে অক্ষম হন, তাহলে মৃত ব্যক্তি অবশ্যই কবরে আজাবে আক্রান্ত হবেন। বরং যদি ওয়ারিশরা ঋণদাতার সাথে যোগাযোগ করে সময় চেয়ে নেন, নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখেন এবং আন্তরিকভাবে ঋণ পরিশোধের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যান, তাহলে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায়, মৃত পিতাকে কবরের আজাবে পাকড়াও করা হবে না।
আর ঋণ পরিশোধের বিষয়ে সদিচ্ছা ও আন্তরিক নিয়ত থাকলে আল্লাহ তাআলা নিজেই সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার নিয়ত করে, আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি তা বিনষ্ট করার নিয়তে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দেন।” (সহিহ বুখারী, হাদীস: ২২২৯)

সুতরাং ওয়ারিশদের কর্তব্য হলো—
১. ঋণ পরিশোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া,
২. বৈধ উপায়ে উপার্জনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা,
৩. অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে ঋণ শোধ শুরু করা,
৪. এবং আল্লাহর কাছে নিয়মিত দু'আ করা।

পিতা বন্ধু ও মাতার বান্ধবীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের সাথে ভালো আচরণের চতুর্থ পদ্ধতি হলো, মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। সামাজিক জীবনে পরহেজগার ব্যক্তিদের মতো তাঁদেরকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁদের মতের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

বিভিন্ন প্রশ্নে পরামর্শের সময় তাঁদেরকে শরিক করা এবং সবসময় শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। একদা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে উত্তম আচরণ।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) এর ইন্তেকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্ধবীদের খোঁজ খবর নিতেন এবং মাঝে মাঝেই তাদের নিকট হাদিয়া পাঠিয়ে তাদেরকে খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এতটুকু পর্যন্ত খেয়াল রাখতেন, যখন কোনো বকরী বা খাসী যবাহ করতেন তখন খাদীজা (রা.) এর বান্ধবীদেরকে বকরীর বড় বড় অংশ- রান, বাহু ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতেন। (তাঁর ইন্তিকালের দীর্ঘদিন পরও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে আমল করতেন।) -বুখারী, মুসলিম। যেহেতু হযরত খাদীজা (রা.) দুর্দিনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়াতেন এবং তাঁর পেরেশানী দূর করার চেষ্টা করতেন, সেজন্য সুখের দিনেও তিনি তাঁকে ভুলতেন না। এখন যেহেতু তিনি জীবিত নেই, তাই তাঁর বান্ধবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। এটা সত্যিকার ভালবাসার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরও তার আন্তরিকতার খেয়াল রেখেছেন। কেননা, আলমে বরযাখে তিনি যখন জানতে পারবেন যে, তাঁর মহব্বতের কারণেই অমুককে হাদিয়া দিয়েছেন, তখন তাঁর রূহ খুবই আনন্দিত হবে।

পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচারণ

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর তাদের সাথে ভালো আচরণের পঞ্চম।পন্থা হলো, মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা। মাতামহের পক্ষের আত্মীয় যেমন: খালা, মামা, নানি, নানা প্রভৃতি এবং পিতামহের পক্ষের আত্মীয় যেমন: চাচা, ফুফু, দাদা-দাদি ইত্যাদি। এ সকল আত্মীয় থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা এবং বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে মাতা-পিতার প্রতি অসম্মান ও মুখ ফিরিয়ে থাকার নামান্তর। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের পিতা ও পিতামহের সাথে কখনও ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ করবে না। মাতা-পিতার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার নামান্তর।

পিতা-মাতার কবর জিয়ারত

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর মায়ের কবর জিয়ারাত করার সময় এমনভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর সাথের সবাইও কেঁদে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর নবীজি বললেন, "আমি আমার রবের কাছে আমার মায়ের কবর জিয়ারাতের অনুমতি চাইলে তিনি তার অনুমতি দিলেন কিন্তু যখন আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম তখন তিনি সেটার অনুমোদন দেননি।" (সহিহ মুসলিম: ৯৭৬; আবু দাউদ: ৩২৩৪; নাসাঈ: ২০৩৩ এবং ইবনে মাজাহ: ১৫৬৯, ১৫৭২)

আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ-এর কাছ থেকে শুনেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি শুক্রবারে তার পিতা-মাতা অথবা তাদের একজনের কবর জিয়ারাত করে এবং সূরাহ ইয়াসিন তিলাওয়াত করে তাহলে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।" (আল মাউজুয়াত: ৩/৫৫৫; আল আজওয়াবাত আল মারদিয়্যাহ: ১/১৭১; সিলসিলাহ আহাদিস আদ দ্বইফাহ: ৫০)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মায়ের কবর জিয়ারাত করবে অথবা তার কোনো আত্মীয়ের কবর জিয়ারাত করবে, সে একটি কবুল হজের প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের কবর জিয়ারাত করতে থাকবে, (তার মৃত্যুর পর) তার কবর মালাইকাহ (ফিরিশতারা) জিয়ারাত করতে থাকবে!" (ইবনে হিব্বান, আল মাজরুবিন: ১/২৫৭); আল মাউজুয়া: ৩/৫৫৬)

উসমান ইবনে সাওদাহ, যার মা একজন ধার্মিক মহিলা ছিলেন; তার নাম ছিল রাহিবাহ, তিনি বর্ণনা করেন, তিনি তার মৃত্যুশয্যায় থাকাবস্থায় মাথা আকাশের দিকে উঁচু করে ধরেন এবং বলেন, "হে আমার মৃত্যুকালের সহায় ও ভরসাস্থল! আমার কবরকে তুমি একাকিত্বে ভরিয়ে দিও না।"

বর্ণনাকারী বলেন, "তারপর তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং আমি প্রতি শুক্রবার তার কবর জিয়ারাত করতে থাকি। সেইসাথে তার এবং উক্ত কবরস্থানের অন্যদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকি।

একরাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জানতে চাইলাম, "আম্মা! আপনি কেমন আছেন?" জবাবে তিনি বললেন, "ও আমার ছেলে! সত্যিই মৃত্যু খুব তীব্র যন্ত্রনার, তবে শুকরিয়া মহান আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাকে সুন্দর আবাসনে রেখেছেন, যেখানে কিয়ামাত পর্যন্ত রেশমি জরিদার গদিতে সজ্জিত আরামের গুল্মের ওপর শায়িত হয়ে (সময় কাটছে)।"

আমি তখন বললাম, "আপনার কী কিছুর প্রয়োজন?" জবাবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ। কবর জিয়ারাত এবং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তুমি কখনো বাদ দিও না। শুক্রবার যখন তুমি কবর জিয়ারাত করতে আসো তখন আমাকে এখানে অভিবাদন জানানো হয়ে থাকে। আমাকে বলা হয়, "হে রাহিবাহ, তোমার ছেলে তোমার জন্য বাড়ি থেকে এ পর্যন্ত এসেছে স্রেফ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। তখন আমি খুশি হই এবং আমার পার্শ্ববর্তী কবরবাসীরাও খুশি হয়ে যায়।" (সিফাহ আস সাফওয়াহ: ৬০৯; আল বিরর ওয়াস সিলাহ: ১৩৬-১৩৭)

আল ফাদল ইবনে মাওয়াফফাক বলেন, "প্রায়ই আমি আমার বাবার কবর জিয়ারাত করতাম। একবার আমি একটি জানাজায় যাবার কারণে সেদিন আর বাবার কবর জিয়ারাত করতে পারিনি। সেদিন রাতের স্বপ্নে আমার বাবা আমাকে বললেন, 'ছেলে আমার, কেন তুমি আজকে আমার কবর জিয়ারাত করতে যাওনি?' জবাবে আমি বললাম, 'আব্বা! আপনি কি আমার এই জিয়ারাত করার ব্যাপারটা জানেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! তুমি যখন আসো এবং আমার কবরের পাশে বসো, দূরের ঐ সাঁকো থেকেই তোমাকে দেখতে পাই। আর যখন ফিরে যাও তখন ঐ সাঁকো পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি তোমাকে দেখতে পাই।"(আল বিরর ওয়াস সিলাহ: ১৩৭)

পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের জন্য ঈসালে সওয়াব করা

মৃত আত্মীয়-স্বজনকে খুশী করার অন্যতম আর একটা করণীয় হলো-তাদের জন্য ঈছালে সওয়াব করতে থাকা। ঈছালে সওয়াব কি জিনিস? এটা নিয়ে আমরা খুব পেরেশান হয়ে যায় যে, কিভাবে কি করব এজন্য নিজে কিছু না করে হুযুর এনে তাদের দিয়ে কিছু খতম করাই।

দু'আ দরুদ পড়িয়ে দু'আ করিয়ে নিই। মনে রাখবেন এটা করার দ্বারা মৃত ব্যক্তির ফায়দা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কোনো উপকার নাও হতে পারে। ঈছালে সওয়াব করা একেবারে সহজ, আপনি নিজেই করতে পারবেন। অন্য কাউকে হায়ার করে নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই। ঈছালে সওয়াব হলো- নফল নামায পড়া, নফল রোযা রাখা, কুরআন তেলাওয়াত করা, যে কোনো সূরা পড়া, (তিনবার সূরায়ে ইখলাছ পড়লে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যায়) অন্নহীনকে অন্ন দেওয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া, কোনো গরীব অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, দান সদকা করা, যিকির আযকার করা, কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়া, জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করা, মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, মসজিদ মাদরাসায় দান করা।

মোটকথা ভালো যেকোন কাজ করে তাদের রুহে সওয়াব পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। এগুলো সব ঈছালে সওয়াব। এর জন্য কোনো অনুষ্ঠান করারও দরকার নেই বা আলাদা করে দু'আ করিয়ে নেয়ারও দরকার নেই। বরং যখন উল্লেখিত কাজগুলো করবেন তখনই মনে মনে নিয়ত করে নিবেন যে, এটা আমার মায়ের জন্য বা পিতার জন্য বা ছেলের জন্য করছি বা অমুকের জন্য করছি। তবে সবচেয়ে ভালো হলো নিয়ত করবেন আমার যত আত্মীয়-স্বজন মারা গেছেন সকলের জন্য করছি। তাহলে এতে সকল মৃতব্যক্তির ফায়দা হবে আপনারও ফায়দা বেশি হবে। এতটুকু কাজ আমরা নিজেরাই যে কোনো সময় করতে পারি। চাইলে প্রতিদিনও করতে পারি। যখন প্রতিনিয়ত তারা সওয়াব পেতে থাকবেন, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, তোমার অমুক ছেলে বা অমুক মেয়ে তোমার জন্য এই হাদিয়া পাঠাচ্ছে। তাতে তারা খুশি হয়ে যাবেন। এভাবে মৃত মাতা-পিতাকে খুশি করা যায়।

সন্তানের গুরুত্ব ও সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয়

মাকিল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা এমন নারী বিয়ে করো, যে স্বামীকে প্রচুর ভালোবাসে এবং অধিক সন্তান জন্ম দেয়। কেননা আমি (কেয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব প্রকাশ করব।" (সনানে আবু দাউদ, ২০৫০)

সন্তান লাভের উপকারিতা রয়েছে অনেক। কারণ, জীবিত থাকাকালীন সন্তানই সবচেয়ে বেশি পিতা-মাতার খেদমত করে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাদের অনুগত হয় এবং তাদের কল্যাণকামী হয়; আর মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু'আ করে এবং ইসালে সওয়াব করে। তদ্রূপ যতদিন তারা দ্বীনের ওপর অবিচল থাকে, ততদিন পিতা-মাতা সওয়াব লাভ করে এবং সন্তান থেকে বংশ বিস্তার হলে মৃত্যুর পরও তাদের মাধ্যমে সওয়াব পায়।

কিয়ামতের দিনও নেক সন্তান অনেক উপকারে আসবে। যে সন্তান শৈশবে মারা গেছে সে পিতা-মাতাকে ক্ষমা করাবে, আর যে বালেগ হয়ে নেক ও আমলদার হয়েছে, সেও নিজ পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো এই যে, সন্তানের মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে দুনিয়াতেও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কেয়ামতের দিনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংখ্যাধিক্যতা দেখে আনন্দিত হয়ে গর্ব করবেন।" (হায়াতুল মুসলিমীন; রুহ, ২০/১৮৯)

যখন থেকে আপনি পিতা-মাতা হয়েছেন তখন থেকে আপনার ও পরিবারের পাশাপাশি শিশু সন্তানের গুরুদায়িত্বও আপনার কাঁধে চেপে বসেছে। এতদিন শুধু নিজের চিন্তা থাকলেও এখন থেকে সন্তানের ভালো-মন্দ নিয়েও ভাবতে হবে। নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচলেই হবে না; বরং পরিবারকেও পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের অধিকারী ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তায়ালার কোনো হুকুমের অবাধ্য হয় না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তাই করে।" (সূরা তাহরীম, আয়াত: ৬)
একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো, নিজেকে সকল অন্যায়, অপকর্ম এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা করা এবং নিজ পরিবারকে সব ধরনের অপরাধ থেকে বিরত

রাখা। সর্বপ্রথম নিজ ঘরে এবং পরিবারের সদস্যদের কাছে দ্বীনের দাওয়াহ পৌঁছে দাওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যেভাবে শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য দুর্গ-প্রাচীরের ফাটল মেরামত করা হয়, সকল চোরাপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেভাবে সন্তানের কল্যাণের জন্য আত্মসংশোধন এবং পরিবারের অন্যান্যদের পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

'আমর বিন শু'আইব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা 'আমর ইবনুল 'আছ (রা.) হ'তে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (সা.) বললেন,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ

"তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর।" (আবুদাঊদ: ৩৫৩০; ইবনু মাজাহ: ২২৯১; মিশকাত: ৩৩৫৪)

আয়েশা (রা.) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূল (স.) বলেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

"নিশ্চয়ই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য হ'ল যা তোমরা নিজেরা উপার্জন কর। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অংশ।" (তিরমিযী: ১৩৫৮)

উক্ত বিষয়ে জাবের ও আব্দুল্লাহ বিন "আমর প্রমুখ সাহাবী থেকেও সহীহ হাদীস সমূহ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক সাহাবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তবে কেউ কেউ বলেন, কেবল প্রয়োজন অনুপাতে নিতে পারেন" (তিরমিযী: ১৩৫৮-এর ব্যাখ্যা)

নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন। যদি তারা কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন। পক্ষান্তরে তাদের পাপের অংশ পিতা-মাতা না পেলেও দুনিয়াতে তারা সন্তানের কারণে বদনামগ্রস্থ হবেন। যেভাবে নূহ (আ.)-এর অবাধ্য পুত্র জগদ্বাসীর নিকটে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে নবী নূহ (আ.) আল্লাহর নিকট ধমক খেয়েছিলেন। (হূদ: ৪৫-৪৬)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা পিতাকে সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। যে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা এবং আদব-শিষ্টাচার শেখানোর ক্ষেত্রে অবহেলা করবে, তাকে এর করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে। অধিকাংশ সন্তানের বিগড়ে যাওয়ার পিছনে পিতার উদাসীনতা দায়ী। কারণ, সন্তানকে খেয়াল-খুশিমতো ছেড়ে দেওয়া, তাকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ও সুন্নাহর সাথে পরিচয় না করানো তাকে বিপথগামী করেছে।

দৈনন্দিন কাজকর্মে দুনিয়ার নিষ্ঠুরতা এবং বস্তুবাদের প্রভাব আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। আমাদের জীবন যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। এখন যদি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সেভাবে প্রস্তুত না করি, তাদেরকে প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে টিকে থাকা না শেখাই তাহলে তারা পদে পদে হোঁচট খাবে। তাদেরকে যদি নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও শারয়ি বিধিবিধান না শেখানো হয়, তাহলে এটা হবে পিতার পক্ষ থেকে সন্তানের প্রতি মারাত্মক অবিচার।

অতএব পারিবারিক শিক্ষা এবং পিতা-মাতার শাসন দুটোই শিশুমনে দ্রুত ও কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি এটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাইরে থেকে শোনা কথার চেয়েও শক্তিশালী। সাইয়েদ কুতুব বলেন, "আমি জ্ঞানের শক্তিতে বিশ্বাস করি, আমি সংস্কৃতির শক্তিতে বিশ্বাস করি; তবে আমি শিক্ষা ও তারবিয়াতের শক্তিতে বেশি বিশ্বাস করি।"

কোনো শিশু জন্ম থেকে মানবিক গুণাবলী ও ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না; বরং এগুলো সে তার পরিবার এবং পরিবেশ থেকে শেখে। প্রতিটি শিশুর মাঝে শুদ্ধ মনন, উত্তম চরিত্র ও নির্মল হৃদয় গড়ে দিতে নিবিড় পরিচর্যা ও পারিবারিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কোনো মানব শিশু কখনো মানুষের পরিচর্যা ব্যতীত সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। আর এ কারণেই একটি শিশুর প্রথম পাঠ তার মায়ের কোল থেকে শুরু হয় এবং মায়েদের উপর ন্যস্ত থাকে শিশুকে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব।

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার কিছু করনীয় নিম্নে তুলেধরা হল।

সন্তানের জন্মের পূর্বে করণীয়

পিতা-মাতার নেককার হওয়া

পিতা-মাতাকে সৎ ও নেককার হতে হব। এর জন্য জরুরি একজন নেককার স্ত্রী খুঁজে বের করা। পরবর্তীতে যে সন্তানের মা হবে। আর মাতৃক্রোড়ই হচ্ছে সন্তানের প্রথম ও প্রধান বিদ্যালয়। এখানেই তরবিয়তের ভিত রচিত হয়। অতএব সচেতন ও বুদ্ধিমান বাবা তো তিনিই যিনি নিজ সন্তানের জন্য উত্তম ও উপযুক্ত একজন মা বেছে নিবেন। তাহলেই আশা করা যায়, সন্তান নেককার ও যোগ্য হয়ে উঠবে। ঠিক যেমন জমি ভালো হলে সেখান থেকে ফসলও ভালো হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

نَكِداً إِلَّا يَخْرُجُ لَا خَبُثَ وَالَّذِي رَبِّهِ، بِإِذْنِ نَبَاتُهُ يَخْرُجُ الطَّيِّبُ وَالْبَلَدُ

“আর যে ভূমি উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের হুকুমে উৎপন্ন হয়। (অর্থাৎ সেখানকার ফসল হয় ভালো) আর যে ভূমি নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে মন্দ ফসল ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হয় না।” (সূরা আ'রাফ: ৫৮)

আমাদের দ্বীন নেককার, ভালো ও বরকতময় একজন নারীকে পত্নী বানাতে উৎসাহিত করে। ঘরে স্বামীর অবর্তমানে সেই পত্নী স্বামীর ঘরদোর ও সন্তানাদি দেখে রাখবে। হেফাজতে রাখবে নিজের ও স্বামীর ইজ্জত-আব্রু।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصَّالِحَةُ الْمَرْأَةُ الدُّنْيَا مَتَاعِ وَخَيْرُ مَتَاعٌ الدُّنْيَا

“দুনিয়া হচ্ছে উপভোগ্য বস্তু। আর সর্বোত্তম উপভোগ্য বস্তু হচ্ছে একজন পুণ্যবতী রমণী।” (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৫৫; সহীহ মুসলিম: ১৪৬৭; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল: ৬৫৬৭)

আরেক হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَدَاكَ تَرِبَتْ الدِّينِ بِذَاتِ فَاغْفَرْ وَلِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا لِمَالِهَا : لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ

“মেয়েদেরকে (সাধারণত) চারটা দিক দেখে বিয়ে করা হয়- তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। তবে তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (সহীহ বুখারী: ৫০৯০; সহীহ মুসলিম: ১৪৬৬)

এই হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, পুরুষেরা নারীদেরকে বিয়ে করে উপর্যুক্ত চারটি কারণে। আর হাদীসে শেষাংশে বলে দেওয়া হয়েছে, বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনাদার নারীকে প্রাধান্য দিতে। দ্বীনদার ও ভালো নারীর আলামতও বলে দেওয়া হয়েছে হাদীসে। আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

إذا وتُطِيعُهُ نَظَرَ إذا تَسُرُّهُ التي " : قال خَيْرٌ النِّساءِ أيُّ :وسلم عليه الله صلى الله لرسول قيل يَكْرَه بما مالها ولا نَفْسِها في تُخَالِفُهُ ولا أَمَرَ

“নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, “সর্বোত্তম নারী কে?” উত্তরে নবীজি বলেন, "যে মহিলার দিকে তাকালে সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। স্বামী আদেশ করলে তা সম্পন্ন করে, এবং বাড়িঘর ও সম্পদের ব্যাপারে অপছন্দনীয় কিছু করে স্বামীর বিরোধিতা করে না।” (সুনানে নাসায়ী: ৩২৩১)

তো এরকম সৎ ও নেককার নারীকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া সন্তানের সর্বপ্রথম হক। সন্তান জন্মের আগেই এই হক পালন করতে হয় বাবাকে। আবুল আসওয়াদ দুওয়ালি রহ. নিজ সন্তানদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের শৈশবে ও বড় হওয়ার পর যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছি। এমনকি তোমাদের জন্মের আগেও যথার্থ দায়িত্ব পালন করেছি তোমাদের প্রতি।” সন্তানরা তখন জিজ্ঞেস করল, "জন্মের আগে কীভাবে পালন করলেন?" আবুল আসওয়াদ বললেন, “তোমাদের জন্য আমি এমন ভালো মা নির্বাচন করেছি যার কারণে তোমাদের কোনো কটু কথা শুনতে হয় না।” (আলী ইবনে মুহাম্মদ মাওয়ারদী আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন: পৃ. ১৩২)

একজন পিতার জন্য যেমন ভালো স্ত্রী বেছে নেওয়া সন্তানের হক, ঠিক তেমনি একজন নারীরও ভালো স্বামী বেছে নেওয়া তার কাছে সন্তানের প্রাপ্য হক। পিতা-মাতা উভয়েই যদি

সৎ ও নেককার হন তবেই তারা মিলেমিশে সৎ ও যোগ্যরূপে সন্তানকে গড়ে তুলতে পারবেন।

সহবাসের দু'আ পড়া

সহবাসের সময় সুন্নাহর অনুসরণ এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দুআ পাঠের প্রতি যত্নশীল হওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ :بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ أَوْ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ثُمَّ قُدِرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ

"তোমরা কেউ যখন স্ত্রী-সহবাস করবে, তখন বলবে بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا অর্থ, আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি সেই সহবাসের মাধ্যমে তাদের দু'জনের ভাগ্যে কোনো বাচ্চা থেকে থাকে তাকে শয়তা ন কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ বুখারী: ৫১৬৫)

বাচ্চার ওপর শয়তানের কুপ্রভাব পড়ার বিষয়টা খুবই স্পষ্ট। তাই সহবাসের সুন্নাহর অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের খাঁটি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। সবাই চায়, নিজেকে এবং নিজের সন্তানাদিকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত রাখতে। সে জন্যই তারা আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চায়। কামনা করে যেন তার অনাগত সন্তানের শয়তানের কোনো আসর না পড়ে।

এসব দিক বিবেচনায় রেখে শরিয়ত সহবাসের সময়ও সুন্নাহ অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছে। বলেছে, দুআ পড়ে নিতে। যেখানে শয়তান থেকে দূরে রাখার প্রার্থনা করা হয়েছে আল্লাহর দরবারে।

নেক সন্তানের জন্য দু'আ করা

আল্লাহর কাছে নেক সন্তানের জন্য দুআ করা। সত্যপন্থীরা এটা সবসময় করে থাকেন। দয়াময়ের বিশেষ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে তাদের নেক সন্তান চাওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তাআলা। তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"এবং (রহমানের বান্দা তারা) যারা (এই) বলে দুআ করে যে,

مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا a رَبَّنَا هَبْ لَنَا

"আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা হবে আমাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে বানান মুত্তাকীদের আদর্শ নেতা।" (সূরা ফুরকান: ৭৪)

এছাড়া কুরআনের জায়গায় জায়গায় নবীদের এমন দুআর কথা এসেছে। যাকারিয়া আ. এর ব্যাপারে এসেছে,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

এ সময় যাকারিয়া নিজ প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"আপনি আপনার কাছ থেকে কোনো পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দুআ শ্রবণকারী।" (আলে ইমরান: ৩৮)

যাকারিয়া আ. এর ব্যাপারে আরো এসেছে, তিনি গোপনে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। দুআতে তিনি যা বলতেন সূরা মারইয়ামের কিছু আয়াতে তা উঠে এসেছে। তিনি বলতেন,

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا 4 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ
مِن وَرَاءِى وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا 5 يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ
وَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

“হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। আমার পর আমার স্বগোত্রকে আমি ভয় করি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে এক জন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবে ইয়াকুব বংশের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে এমন বানান, যে হবে (আপনার দরবারেও) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত।” (সূরা মারইয়াম ৪-৬)

ওদিকে ইমরানের সেই পূণ্যবতী স্ত্রীর কথা ভাবুন, যিনি গর্ভবতী অবস্থায় নিজের পেটের সন্তানকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন আল্লাহর নামে। দু’আ করেছিলেন এভাবে,

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে সন্তান আছে তাকে আমি একান্ত আপনার জন্যেই উৎসর্গ করে দিলাম। আমার পক্ষ থেকে আপনি একে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (আলে ইমরান: ৩৫)

অতএব পিতা-মাতার উচিত, দুআ কবুলের সময়গুলোতে বিনীত হয়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা। আল্লাহর কাছে চাওয়া যেন তিনি নেক সন্তান দান করেন। এই নেক সন্তান পিতা-মাতার কাজে আসে জীবদ্দশায় এবং মরনের পরেও।

কাজে কেনইবা আসবে না, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ القَطعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“মানুষ যখন মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ছাড়া তার সকল আমল (এর সওয়াব) বন্ধ হয়ে যায়।
ক. সদকায়ে জারিয়া অথবা
খ. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় অথবা
গ. নেককার সন্তান যে তার জন্য দুআ করতে থাকে।” (সহীহ মুসলিম: ১৬৩১)

তো নেক সন্তান এমন এক সম্পদ যার কল্যাণ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও পেতে থাকেন। ভালো একটা ছেলে বা মেয়ে দুনিয়ায় রেখে যেতে পারলে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হয়। কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ পিতা-মাতা বুঝেই না ব্যপারটা।

কুরআন ও হাদীসে নেক সন্তান পেতে, তাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজতে রাখতে যেমন দুআ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে তেমনি সন্তানের বিরুদ্ধে বদদুআ করতেও নিষেধ করেছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন,

لا تَدْعُوا على أنفُسِكُم ولا تَدْعُوا على أولادِكُم ولا تَدْعُوا على خَدَمِكُم ولا تَدْعُوا على أموالكم لا تُوافِقُوا مِنَ الله ساعةَ نيل فيها عطاء فيستجيب لكم

“তোমরা নিজেদেরকে, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে এবং চাকর-বাকরকে কখনো বদ-দুআ দেবে না। এমনকি নিজেদের ধন-সম্পদের প্রতি কোনো বদ-দুআ করবে না কখনোই। কেননা এমন মুহূর্ত আছে যখন দুআ (বা বদ-দুআ যাই করা হোক তা) কবুল হয়ে যায়। কাজেই তোমার ঐ বদ-দুআটা যেন সেই মুহূর্তে না হয়ে যায়।” (সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩২)

আরেক হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ المَظْلُومِ وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى ولده

“তিনটি দুআ এমন যেগুলো নিশ্চিত কবুলিয়ত লাভ করে। তাতে কোনোই সন্দেহ নেই! মজলুমের দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানের জন্য পিতার দুআ বা বদদুআ।” (সুনানে তিরমিযী: ১৯০৫; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৬২; ইমাম বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ: ৪৮১; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল: ৭৪৫৮)

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি একবার আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. এর কাছে এসে নিজ সন্তানের ব্যাপারে অভিযোগ করল। ইবনুল মুবারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি কখনো

সেই ছেলেকে বদদুআ দিয়েছিলে?" লোকটি বলল, "হ্যাঁ দিয়েছিলাম।" এটা শুনে ইবনুল মুবারক বললেন, "তাকে তো তুমিই নষ্ট করেছ!"

দুআর গুরুত্ব কেমন সে সম্পর্কে নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

[الدعاء هو العبادة قال ربكم : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60

"দু'আ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। (আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,) তোমাদের রব বলেন, (তোমরা) আমার কাছে দুআ কর আমি তা কবুল করব।" (সুনানে আবু দাউদ: ১৪৭৯; সুনানে তিরমিযি: ২৯৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮২৮)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, পিতা-মাতার অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে, তাদের জন্মের আগেই তাদের নেককারিতার জন্য দু'আ করা।

গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দু'আ করা

গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা। কোনোভাবেই তাকে কষ্ট না দেওয়া কিংবা কষ্টের কারণও না হওয়া। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। সন্তানের যত্নে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকা। এগুলো অনাগত সন্তানের প্রাপ্য অধিকার।

পেটের সন্তানকে দূর্বল করা বা মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে মায়ের নিজেকে ইচ্ছা করে দূর্বল করা বা বাচ্চার উপকারী খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা বৈধ নয়। এটা জঘন্য পর্যায়ের অপরাধ ও বাড়াবাড়ি। এর মাধ্যমে সন্তানের হক নষ্ট করা হয়।

পেটের সন্তানের ক্ষতি যারা করে, বিভিন্নভাবে গর্ভস্থ শিশুকে যারা কষ্ট দেয় তারা এমন গর্হিত কাজ করে কীভাবে! ওরা কি সেই সব হাদীস জানে না, যেগুলো থেকে বুঝে আসে, সন্তান ইহকাল ও পরকালের শ্রেষ্ঠ সম্পদ!? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَكَ وَلَدِكَ بِاسْتِغْفَارِ :فَيُقَالُ هَذَا أَنَّى : فَيَقُولُ الْجَنَّةِ فِي دَرَجَتُهُ لَتُرْفَعُ الرَّجُلَ إِنَّ

“কিছু মানুষের মর্যাদা জান্নাতে বুলন্দ করা হবে, তখন সে বলবে, “এটা কিভাবে হলো?” তখন তাকে জানানো হবে, “তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তিগফারের কারণে।” (সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৬৬০; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল : ১০২৩৩)

সুতরাং গর্ভপাত বা অন্য কোনো মাধ্যমে যদি সন্তান নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হতে পারে সেই পিতা-মাতা অনেক বড় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তাই পিতা-মাতার উচিত, নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে গর্ভস্থ সন্তানের যত্ন নেওয়া। তবে সামর্থ্যের বাইরের কোনো দায়িত্ব আল্লাহ কাউকে দেন না।

সন্তানের জন্মের পরে করণীয়

তাহনিক করানো

সন্তানকে সুন্নত তরিকায় স্বাগত জানানো। অর্থাৎ বাচ্চাকে তাহনিক (মিষ্টিদ্রব্য চিবিয়ে সেটার রস মুখে দেওয়া) করানো এবং তার জন্য বরকতের দু'আ করা।
ইমাম নববি রহ. বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নত। অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেওয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে। তিনি বলেন, কতক আলেম বলেছেন, খেজুর সম্ভব না হলে অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, সবার নিকটই তাহনিক করা মুস্তাহাব, আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেননি। (শরহে মুহাজ্জাব: ৮/৪২৪)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ তালহা ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর চিবালেন। অতঃপর তা বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। বাচ্চাটি জিব্বা দিয়ে চুসে ও ঠোটে লেগে থাকা অংশ চেটে খেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে বলেন, দেখ, আনসারদের খেজুর কত প্রিয়!" (সহীহ মুসলিম)

আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى

"আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিলে আমি তাকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দু'আ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।" (সহীহ বুখারী: ৫৪৬৭; সহীহ মুসলিম: ২১৪৫)

সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নাম রাখা

সন্তানের উত্তম ও উপযুক্ত নাম রাখা। শুধু সৎ ও পূণ্যবতী মা নির্বাচন করলেই সন্তানের হক আদায় হয়ে যায় না। বরং উত্তম নাম বাছাই করাও সন্তানের প্রাপ্য অন্যতম হক তথা অধিকার।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম এই নাম প্রসঙ্গে চমৎকার একটি পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন নিজ গ্রন্থে। সেখানে তিনি লেখেন, "নাম হচ্ছে যে কোনো জিনিসের মূল সাইনবোর্ড বা প্রতীক। এর মাধ্যমে সেই জিনিসটার পরিচয় স্পষ্ট হয়। তাই প্রজ্ঞার দাবী হচ্ছে, নামের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসটার মিল ও সম্পর্ক থাকবে। কোনো রকম সম্পর্ক ও মিল ছাড়া আজগুবি কোনো নাম রেখে দেওয়া বুদ্ধির পরিচয় বহন করে না। বাস্তবতাও বিষয়টাকে প্রত্যাখ্যান করে। তাছাড়া দেখা যায়, নামের একটা প্রভাব পড়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর। উত্তম-অনুত্তম (ধরণের নাম), (ব্যক্তিকে ওজনে) হালকা-ভারী (বোঝায় এমন নাম) বা (ব্যক্তিকে দেখতে) ঘন-পাতলা (বোঝায় এমন নাম) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে নামের কিছু প্রভাব থাকেই।
কবি বলেন,

"যাহার যাহা উপাধি তুমি কানে শুনতে পাবে,
খুঁজলে তাহার মধ্যে তাহার যথার্থতাও পাবে।"

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো নাম পছন্দ করতেন। স্বপ্নে বা জাগরণে ব্যক্তি-বস্তুর নামের অর্থ ও মর্মকে গুরুত্ব দিতেন। খারাপ নামের জায়গা পছন্দ করতেন না। সেখান দিয়ে অতিক্রম করতেও চাইতেন না তিনি। নামের সাথে যেহেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর সম্পর্ক থাকে তাই একটা বললে আরেকটার কথা এমনিতেই মাথায় চলে আসে।" (ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ: ৩৩৬-৩৪০)

সুতরাং পিতার কর্তব্য হচ্ছে, হারাম বা মুসলিমদের জন্য অশোভনীয় নাম রাখা থেকে বিরত থাকা। সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত,

أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ : قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا اسْمُهُ قَالَ: فُلَانٌ قَالَ: وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ

“যখন মুনযির ইবনে আবু উসাইদ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে নিজের উরুর উপর বসালেন। আবু উসাইদ রাযি, পাশেই বসা ছিলেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সামনের কোনো কিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে আবু উসাইদ রাযি, কাউকে বলে তাঁর উরু থেকে সন্তানকে উঠিয়ে নিয়ে যান। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “শিশুটি কোথায়?” আবু উসাইদ বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি।” নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, “তার নাম কী?” তিনি বললেন, ‘অমুক।’ নবী সা. বললেন, “বরং তার নাম মুনযির।” সে দিন থেকে আবু উসাযইদ সন্তানের নাম রাখেন মুনযির।” (সহীহ বুখারী: ৬১৯১; সহীহ মুসলিম: ২১৪৯)

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ولد لى اللَّيْلَةَ غُلام فسميته باسم أبي إبراهيم

“আজ রাতে আমার ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি আমার পূর্বপুরুষের নামানুসারে তার নাম রেখেছি ইবরাহিম।” (সুনানে আবু দাউদ : ৩১২৬; সহীহ মুসলিম: ২৩১৫)

এই হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, জন্মের প্রথম দিনও সন্তানের নাম রাখা যায়। আবার এর জন্য ৭ম দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। এর দুয়েকদিন আগে পরে রাখলেও কোনো সমস্যা নেই। (ইবনুল কাইয়িম জাওযি, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ : পৃ. ১৫১, ১৬২; ইবনুল কাইয়িম জাওযি, যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ: ২/৩৩৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী বলেছেন,

أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান।” (সুনানে তিরমিযী: ২৮৩৩; সহীহ মুসলিম: ২১৩২)

হাফেজ ইবনে হাযম বলেন, "আল্লাহর নামের দিকে সম্পৃক্ত নাম-যেমন আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান- রাখা মুস্তাহাব।" (ইবনে হাযম মারাতিবুল ইজমা' : পৃ. ১৫৪; ইবনুল কাইয়িম জাওযি, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ : পৃ. ১৬৪)

তো সন্তানের সুন্দর ও উপযুক্ত নাম রাখা পিতা-মাতার কাছে সন্তানের প্রাপ্য হক। এই হক যথাযথরূপে পালন করা আবশ্যক। কিছু বাবা এমন নাম রাখেন যেটার কারণে ভবিষ্যতে সন্তানদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়। কারণ, সেই নামটা হয়তো নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর কাছে নিন্দিত বা নামটার মধ্যে সত্যিই দোষনীয় কিছু আছে।

আর এটা তো আমরা সবাই জানি যে, কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া হারাম। অতএব কোনো পিতা-মাতা যেন নাম রাখার মাধ্যমে নিজ সন্তানের কষ্ট পাওয়ার কারণ না হন।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস, গোলাম বা অনুগত বোঝায় এমন কোনো নাম রাখা জায়েয নয়। (ইবনে হাযম মারাতিবুল ইজমা' পৃ. ১৫৪; ইবনুল কাইয়িম জাওযি, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ১৬৫-১৬৭)

কাফেরদের নাম কিংবা নিজের প্রশংসাবোধক কোনো নাম রাখাও অবৈধ। (ইবনুল কাইয়িম জাওযি, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ১৭০)

কারো খারাপ নাম শুনলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা পরিবর্তন করে তার ভালো নাম রেখে দিতেন। বিভিন্ন হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'عاصية' (তথা অবাধ্য) এর নাম পরিবর্তন করে দিলেন এবং বললেন তুমি 'جميلة' (তথা সুন্দরী)। (সহীহ মুসলিম: ২১৩৯-১)

মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سميت ابنتك ؟ قال : سميتُها بَرَّة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سُقِيتُ بَرَّة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: " لا تُزَكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم" فقال: ما نُسَمِّيها؟ فقال: "سَمُّوها زَيْنَبَ

“একদা যায়নাব বিনতে আবু সালামা (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি তোমার মেয়ের নাম কী রেখেছ?" তিনি বলেন, "আমি তার নাম রেখেছি বাররা।” তখন যায়নাব (রা.) বললেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের নাম রাখতেন নিষেধ করেছেন। আগে আমার নাম ছিল বাররা। তখন নবী (স.) বলেছিলেন, “তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করো না। তোমাদের মধ্যে কে নেককার তা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।” তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে, “তাহলে আমরা তার নাম কী রাখবো?” তিনি বলেন, তোমরা তার নাম রাখো, যায়নাব।” (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫৩; সহীহ মুসলিম: ২১৪২)

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস (অবাধ্য), আযীয (পরাক্রমশালী), আতালাহ (কঠোর), শয়তান (চরম অবাধ্য, দুষ্ট) হাকাম (বিচারক), গুরাব (কাক, দূরবর্তী) হুবাব (সাপ) ও শিহাব (উল্কা) নামকে পরিবর্তন করে রেখেছেন হিশাম (বিধ্বস্তকারী)। এছাড়া হারব (যুদ্ধ) এর পরিবর্তে সালাম (শান্তি), মুদতাদি’ (শয়নকারী) পাল্টে নাম রেখেছেন মুনবাইস (জাগরিত)। আফিরাহ (অনুর্বর) নামক এলাকাকে খাদিরাহ (সবুজ) আর দ্বালালাহ (বিপথ) উপত্যকাকে নাম দিয়েছেন হুদা (হিদায়াতের পথ)। বন যিনয়াহ (জারজ সন্তান) এবং বনু মুগবিয়াহ (বিপথগামী নারীর সন্তান) এর নাম পাল্টে নাম দিয়েছেন বন্ রিশদা (হিদায়াতপ্রাপ্ত সন্তান)।” (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫৬)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, সুন্দর নাম রাখা সন্তানের প্রাপ্য গুরুত্বপূর্ণ হক।

আকিকা করা

সন্তানের নামে আকিকা করা। এটা শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা এবং নবীজির সুন্নাত। সাঈদ ইবনে মানসুর রহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি অনেক সাহাবিকে পেয়েছি। তাদের কাউকে ছেলেমেয়ের আকিকা বর্জন করতে দেখি নি আমি।” (ইবনুল কাইয়িম জাওযি, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ : পৃ. ৪৫; আল্লামা আইনী, উমদাতুল কারী: ২১/৮৩)

এই আকিকা বাচ্চা জন্মের সপ্তম বা চৌদ্দতম কিংবা একবিংশতম দিনে হতে পারে। সালেহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, "আকিকার সময়সূচির ক্ষেত্রে আমার বাবা বলেছেন, "আকিকার পশু সপ্তম দিনে জবাই করতে হয়। না করতে পারলে চৌদ্দতম দিনে করবে। তাও না পারলে একবিংশতম দিনেও করতে পারে।" (মাসায়িলুল ইমাম আহমদ: ২/২১০) আকিকাতে ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দুটি আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করতে হয়। কেননা সকল শিশুই তার আকীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবাই করতে হবে। সেদিনই নাম রাখতে হবে এবং মাথাও নেড়া করতে হবে তার। এগুলো সবই হাদীসের নির্দেশনা। (ইবনু মা-জাহ: ৩১৬৫; সুনানে তিরমিযি: ১৫২২; মুসনাদে আহমাদ: ৩৩/২৭১, ২০০৮৩, ২০১৯৩, ২০১৯৪; সুনানে আবু দাউদ: ২৮৩৮; সুনানে নাসাঈ: ৪২২০)

হযরত ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হুসাইন রা-এর পক্ষ থেকে একটি একটি ভেড়া আকীকা করেছেন। (আবু দাউদ: ২/৩৯২)

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার কোনো সন্তান জন্মলাভ করে সে যেন উট, গরু অথবা ছাগল দ্বারা আকীকা করে। (আলমুজামুল আওসাত: ২/৩৭১)

বুকের দুধ পান করানো

ঠিকঠাকভাবে সন্তানের স্তন্যপানের ব্যবস্থা করা। পারতপক্ষে শিশুকে তার নিজ মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কারণ, মায়ের দুধই শিশুর জন্য সবচেয়ে উপযোগী ও উপকারী খাবার। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। (এ সময়কাল) তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়।" (সূরা বাকারা: ২৩৩)

রাসূল (স.) বলেছেন, এজন নারী গর্ভধারণ করা থেকে শুরু করে সন্তান প্রসব করা এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সময়ে (যে কষ্ট স্বীকার করে, তার) মর্যাদা ও সওয়াব হল ইসলামের পথে সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত ব্যক্তি সমপর্যায়ের (কেননা প্রহরীও সর্বদা কষ্ট স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকে)। যদি এই সময়ের মাঝে কো নারী মারা যায়, সে শহীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। (তবারানী আন ইবনে ওমর; কিসওয়াতুন নিসা; বেহেশতী জেওর, ৮/৪৬৬)

রাসূল (স.) বলেছেন, "একজন নারী যখন সন্তানকে দুধ পান করায়, তখন প্রতিটি ঢোক দুধের বিনিময় সে কোনো প্রানীকে জীবন দান করার সওয়াব লাভ করে। অতঃপর যখন সে সন্তানের দুধ ছাড়ায়, তখন ফেরেশতা তাকে (অভিনন্দন জানিয়ে) তা কাঁধে হাত রেখে বলে, তোমার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। এখন থেকে ভবিষ্যতে যে গুনাহ করবে তা লেখা হবে।" এই গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সগীরা গুনাহ। সগীরা গুনাহগুলো মাফ হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। (তবারানী আন ইবনে ওমর; কিসওয়াতুন নিসা; বেহেশতী জেওর, ৮/৪৬৭)

স্তন্যদানে মায়ের যেমন উপকার আছে তেমনি অনেক উপকৃত হয় শিশুও। এটি প্রমাণিত সত্য। স্তন্যদানের মধ্য দিয়ে শিশু তার মায়ের বিশেষ সান্নিধ্য, আদর-স্নেহ ও যত্ন পায়। যেটা অন্য কোনো ভাবে পাওয়া অসম্ভব। এছাড়াও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আরো বহু উপকার এতে আছে অবশ্যই। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ এর নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁর কোনো নির্দেশ ইহকালীন-পরকালীন কল্যাণশূণ্য হতে পারে না কখনোই।
আর কোনোমতেই মায়ের পক্ষে সন্তানের কোনো ক্ষতি করা বৈধ হবে না। আল্লাহ বলছেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

"সন্তান যে পিতার, তার কর্তব্য ন্যায়সম্মতভাবে মায়েদের খোরপোষের ভার বহন করা। (হাঁ) কাউকে তার সামর্থ্যরে বাইরে ক্লেশ দেওয়া হয় না। মা তার সন্তানকে হাতিয়ার বানিয়ে (পিতার) ক্ষতি করতে পারবে না এবং পিতাও তার সন্তানের দোহাই দিয়ে (মায়ের) ক্ষতি করতে পারবে না।" (সুরা বাকারা: ২৩৩)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম যুহরি বলেন, "অর্থাৎ শরিয়াসম্মত ভরণপোষণ দেওয়ার পরেও মা সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না। বলতে পারবে না, আমি

তাকে স্তন্যদান করব না। অথচ শিশুর জন্য তার মায়ের দুধই সবচেয়ে বেশি উপকারী। আবার অন্য যে কোনো মহিলার চেয়ে গর্ভধারিনী মা সন্তানের প্রতি বেশি স্নেহশীল ও মায়াবতী। অপরদিকে পিতাও গর্ভধারিনী মাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মহিলাকে দুধ পান করানোর জন্য রাখতে পারবে না।" (সহীহ বুখারী: ৫৩৫৯)
ইবনুল কাইয়িম রহ. নিজ কিতাব তুহফাতুল মাওদূদে উপর্যুক্ত আয়াত থেকে বেশ কিছু বিধান বের করেছেন।

সেগুলো হচ্ছে এই:
১. দুধপানের সময়কাল দুই বছর। বাচ্চার প্রয়োজনে হলে এই পুরো সময় দুধ পান করা তার হক বা অধিকার। আরবী আয়াতে 'কামিলাইন' শব্দ এনে বিষয়টাকে আরো সুস্পষ্ট করা হয়েছে। যেন কেউ ভিন্ন কিছু না বোঝে।

২. দুই বছরের আগেই যদি পিতা-মাতা পারস্পরিক পরামর্শ ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে বাচ্চার দুধ ছাড়াতে চায় এবং এতে বাচ্চার কোনো ক্ষতিও না হয় তাহলে সেই অনুমতি তাদের রয়েছে।

৩. মা অপছন্দ করলেও অন্য কোন নারীকে বাচ্চার দুধ মা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার অধকার বাবার রয়েছে। তবে শর্ত হল, এতে বাচ্চার বা বাচ্চার মায়ের কোন ক্ষতি হওয়া যাবেনা।
এছাড়াও বিভিন্ন হাদীস পর্যালোচনাতেও বাচ্চার মায়ের বুকের দুধ পান করাতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বুকের দুধ খাওয়ালে বাচ্চার যেমন উপকার হয় তেমনি মায়েরও উপকার হয়। বাচ্চা সবদিক থেকে পরিপূর্ণ খাবার পেয়ে থাকে। মা নিরাপদ থাকে স্তন ও জরায়ু ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে। প্রসবকালীন জটিলতা থেকেও দ্রুত মুক্তি মেলে। সুতরাং একান্ত সমস্যা না থাকলে মায়ের দুধের অধিকার থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

ছেলে সন্তানের সুন্নাতে খাতনা করানো

একটি হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচটি বিষয় ইসলামের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে একটি হল, খাতনা করা। (সুনানে আবূ দাউদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ১/৪৪)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, চারটি কাজ সুন্নাতুল আম্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে একটি হল, খাতনা করা। (সুনানে তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ: ৪৪-৪৫)

ফলে খাতনাকে সুন্নাতে ইবরাহীমী বলেও আখ্যায়িত করা হয়। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদীকে ইবরাহীম (আ.) এর অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

"অতঃপর আমি আপনার প্রতি এ মর্মে নির্দেশ করেছি যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করুন।" (সুরা নাহল: ১২৩)

ইসলামে খাতনা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এবং এটা নবীদের থেকে ধারা পরম্পরায় চলে আসা এমন একটি সুন্নাত, যা পালন না করা হলে গুনাহগার হবে বলে ফুকাহায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। (হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্টা ৭৮)

খাতনার মাধ্যমে একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে আলাদা করা যায়। কারণ, মুসলমান খাতনা করে, অমুসলিম খাতনা করে না। তাই খাতনা না করা হলে অমুসলিমের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়, যা হাদীসের ভাষায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (সুনানে আবূ দাউদ: ৫৫৯)

খাতনা করার মাধ্যমে ইস্তিঞ্জা থেকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা উত্তমরূপে অর্জন করা যায়।

অনেক ফকীহর মতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিন থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় খাতনা করানো জায়েয আছে। তবে উত্তম হল, যখন বাচ্চার খাতনার কষ্ট সহ্য করার মত সামর্থ্য হয় তখন তার খাতনা করানো। ফুকাহায়ে কেরাম সন্তানের বয়স ৭ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত সময় খাতনার জন্য উত্তম মুস্তাহাব সময় বলে উল্লেখ করেছেন। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/২০৮)

হালাল সম্পদ হতে খরচ করা

পিতা-মাতা কর্তব্য সন্তানদের জন্য খরচ করা এবং সেটা অবশ্যই হালাল সম্পদ থেকে। হালাল সম্পদ থেকে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। সকল ধরনে হারাম তাদের দূরে রাখা।

পিতা-মাতার জন্য কোনভাবেই জায়েয হবেনা সন্তানদেরকে হারাম খাওয়ানো। এটা তাদের সাথে প্রতারণার শামিল। হারাম খাবারে গড়ে ওঠা শরীর জাহান্নামের আগুনে জ্বলার উপযুক্ত। হালাল সম্পদ থেকে সন্তানদের জন্য খরচ করলেই না সেটা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হবে এবং এর বিনিময় পাওয়া যাবে।

সুতরাং সন্তানদের জন্য হালাল সম্পদ খরচ করা জরুরী। তবেই না তারা নেককার হবে এবং পিতা-মাতা তার থেকে উপকৃত হতে পারবে।

উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া

সন্তানদের উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং সেটা ধর্মীয় ও জাগতিক উভয়।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সন্তানদের মনে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া। ভালো কাজ করতে ও ভালো সঙ্গ নির্বাচনে তাদেরকে উৎসাহিত করা।
আর খারাপ কাজ ও খারাপ সঙ্গ থেকে বিরত রাখা। নামাজের ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তোলা।
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“আপনি (হে নবী!) আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না। উল্টো আমিই আপনাকে রিযিক দেই। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যেই নির্ধারিত।” (সূরা ত্বা-হা: ১৩২)

হাদিসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مروا أولاكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

“তোমাদের সন্তানরা যখন সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামাযের আদেশ দেবে। তাদের বয়স দশ হওয়ার পরও নামায না পড়লে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে।” (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল: ৬৬৫০; নাসিরুদ্দিন আলবানী, ইরওয়াউল গালিল: ২৪৭)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. লেখেন, “এই হাদিস থেকে মোট তিনটি নির্দেশনা পাওয়া যায়।

১. সন্তানদেরকে নামাজের নির্দেশ দেওয়া।
২. দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে প্রহার করা।
৩. ছেলেমেয়ের বিছানা আলাদা করে দেওয়া।” (ইবন কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ : পৃ. ৩২৮)

তিনি আরো বলেন, “বাচ্চা যদিও শরিয়ত দ্বারা সম্বোধিত না, কিন্তু তার অভিভাবকরা তো অবশ্যই সম্বোধিত। তাই বাচ্চা হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া অভিভাবকদের জন্য বৈধ নয়। কারণ, এতে সেই হারামে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তারা, পরে সে অভ্যাস ছটানো বেশ কষ্টের ব্যাপার হবে। এটাই উলামায়ে কেরামের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত।

একদল আলেম বলেন, “বাচ্চা যেহেতু শরীয়ত দ্বারা সম্মোধিত না, তাই তার জন্য কোনো কিছু হারাম হবে না। ঠিক যেমন চতুষ্পদ জন্তুর জন্য অবৈধ বলে কিছু নেই।”

এটা একেবারে খোঁড়া যুক্তি। কেননা বাচ্চা এই মূহুর্তে শরীয়ত দ্বারা সম্বোধিত না হলেও অচিরেই তাকে শরীয়ত-সম্বোধিত হতে হবে। তাই ছোট থেকেই অভ্যাস না থাকলে বড় হয়ে শরিয়ত মোতাবেক চলাটা অসম্ভব প্রায় হয়ে যাবে তার পক্ষে। সেজন্যই বাচ্চাকে অযু ছাড়া বা বিবস্ত্র হয়ে কিংবা নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়তে দেওয়া যাবে না। মাদক, জুয়া, সমকামিতা ইত্যাদি জঘন্য অপকর্মে জড়ানোর কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না।” (ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৩৫৩)

আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন, “১০ বছর হয়ে গেলে বাচ্চার আকল-বুদ্ধি শক্তিসামর্থ্য বাড়ে। তখন ইবাদত বন্দেগী করতে সমর্থ হয় সে। তাই সেই বয়সে নামাজ ছাড়লে প্রহার করতে হবে তাকে। এমনটাই নবীজির নির্দেশ। এই প্রহার মূলত শিক্ষা ও অনুশীলনমূলক।

১০ বছর বয়স হলে একটা বাচ্চার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তার মধ্যে এক ধরণের পরিপক্কতা আসে। সেজন্যে অধিকাংশ ফকিহ বলেছেন, এ বয়সে ঈমান আনা তার উপর ফরজ। যদিও দ্বীনের অন্যান্য শাখাগত বিধানগুলো তখনও সরাসরি প্রযোজ্য হয় না তার ক্ষেত্রে। ঈমান না আনলে সেজন্য তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে পরকালে। আবুল খাত্তাব প্রমুখ আলেমগণ এই মত পোষণ করেছেন। এটা খুবই শক্তিশালী একটি মত। কারণ, আল্লাহ তাআলাকে চেনা এবং তাঁর তাওহীদকে স্বীকার করার মতো বুঝ ও সামর্থ্য তার হয়ে যায় ১০ বছর বয়সেই। নবীজিসহ সকল রাসূলকে সত্যায়নের দলীলাদি বোঝার মতো বোধও এসে যায় তার মধ্যে। ঠিক যেমন সে দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কল্যাণ বুঝতে পারে। তাই সেই বয়সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরির ক্ষেত্রে তাকে মাজুর মনে করা যাবে না। কেননা দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেয়ে আল্লাহর তাওহীদের দলিল বোঝা আরো বেশি সহজ ও যুক্তিসঙ্গত।" (ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৪১৫-৪১৬)

সে হিসাবে সন্তানের হৃদয়ে শৈশবেই ঈমানের বীজ বপন করে দেওয়া কর্তব্য। অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে এই কাজের কারণে পিতা-মাতা আল্লাহর দরবারে বেশি উত্তম ও পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবেন। এই ঈমান সকল কল্যাণের সূচনা, সমস্ত ভালো ও নেকির শিকড়। যেকোনো ছেলে-মেয়েকে সঠিক পথে পরিচালিত করার সবচেয়ে বড় মূলনীতি এটাই।

আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে তার শৈশবে নিজের সাথে বাহনে চড়া অবস্থায় তরবিয়ত করেছেন। বলেছেন,

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

"বাবু! তোমাকে আমি কিছু বিষয় জানাচ্ছি। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে। তিনি তোমাকে হিফাযত রাখবেন; আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে (যে কোনো বিপদে) তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। কিছু চাওয়ার হলে আল্লাহর কাছেই চাবে, সাহায্য চাওয়ার হলেও তাঁর দুয়ারেই ধর্ণা দিবে। জেনে রেখ, দুনিয়ার সবাই মিলে যদি তোমার উপকার করতে চায় তবুও আল্লাহ যতটুকু তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন ততটুকুই করতে পারবে। আর সবাই মিলে তোমার ক্ষতির ফন্দি আঁটলেও তোমার কপালে যতটুকু আল্লাহ লিখে রেখছেন তার

বাইরে কিছু করতে পারবে না। (ভাগ্যের) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং (ভাগ্য লিখিত) লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।" (সুনানে তিরমিযী: ২৫১৬; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল: ২৬৬৪)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী তাঁর রচিত জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম গ্রন্থে লেখেন, "যে ব্যক্তি শৈশবে এবং যৌবনের উত্তাল সময়ে আল্লাহর বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে আল্লাহ তাআলা বার্ধক্য ও দুর্বলতায় তাকে হিফাযত করবেন। সে বয়সে তার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি তিনি ঠিকঠাক রাখবেন।" (ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/৪৬৬)

সুতরাং আল্লাহর ইবাদতের মানসিকতা এবং ইখলাস দিয়ে অন্তর পরিপূর্ণ থাকতে হবে। এ বিষয়গুলো বদ্ধমূল করে দিতে হবে সন্তানদের হৃদয়ে। এতে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ব্যাপারটা তারা অনুধাবন করতে পারবে। কল্যাণের পথ খুঁজে পাবে। আর এতেই নিহিত আছে পিতা-মাতা ও সন্তানের উভয় জগতের কল্যাণ।

উত্তম আখলাকে গড়ে তোলা

সন্তানদেরকে উত্তম আখলাকে গড়ে তোলা। মন্দ স্বভাব চরিত্রের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা। এগুলো উপকারী ইলমের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। উত্তম আখলাকের প্রতি শরিয়ত অনেক জোর দিয়েছে। নিজ ছেলেকে দেওয়া হযরত লুকমানের উপদেশগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এভাবে,

يَبْنَى أَقِمِ الصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 17 وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 18 وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحمير

"বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও। আর আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এটা খুবই সাহসিকতার কাজ। এবং অহংকারবশে মানুষকে তুমি অবজ্ঞা করো না। পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ

কণ্ঠস্বর রাখ সংযত। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।" (সূরা লুকমান: ১৭-১৯)

অতএব সন্তানের প্রতি সবচেয়ে বড় সদাচার হচ্ছে, তাকে উত্তম ও উপকারী তরবিয়ত দেওয়া। এটাই তার জন্য সবচে বড় শিক্ষা।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।” (আত তাহরীম: ৬)

এই আয়াত উল্লেখপূর্বক হাফেজ শাওকানি ফাতহুল কাদির গ্রন্থে লেখেন, “তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে রক্ষা করো” এর ব্যাখ্যায় আলি ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “অর্থাৎ তোমরা নিজেরা ভালো জিনিস শিখো এবং পরিবারকেও শেখাও। এবং তাদেরকে শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করে তোলো।” (আল্লামা শাওকানি, ফাতহুল কাদীর: ৫/৩৫৫; ইবনু আবিদ দুনয়া, কিতাবুল ইয়াল : ১/৩২৩; ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৩২৮)

জনৈক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তুমি তোমার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচারে গড়ে তোলো। কেননা এ ব্যাপারে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। আর তোমার সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে, সে তোমার সাথে সদাচারণ করেছি কিনা।” (ইমাম বায়হাকি, সুনানে কুবরা ৩/৮৪; শুআবুল ঈমান : ৮৬৬২)

উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “অর্থাৎ পরিবার-পরিজনকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তোলো।”

আর এটা তো অনস্বীকার্য, আমরা গাছ যেমন লাগাবো ফলও পাবো তেমনি। ভালো লাগালে ভালো, মন্দ হলে তার ফলটাও মন্দই হবে নিশ্চয়। আর খারাপ তরবিয়তের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সন্তান, পিতা-মাতা বরং গোটা সমাজের উপরেই পড়ে।

সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে পিতা-মাতা যেমন জিজ্ঞাসিত হবেন, তেমন সন্তানও পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং সন্তানদেরকে সদাচারণ, সত্যবাদিতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, জবান ও সময়ের হেফাজত এবং উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকা শেখাতে হবে। তাহলে তারা আর আল্লাহর ইচ্ছায় ভুল পথে এগোবে না। অন্যথায় যা হবার তাই হবে।

কবি বলেন,

"ছোট বাচ্চারা গড়ে ওঠে সেভাবে,
বাবারা তাদের গড়ে তোলে যেভাবে।"

অতএব উত্তম ও মহান চরিত্রের উপর সন্তানাদিকে গড়ে তোলা এবং খারাপ স্বভাব থেকে তাদেরকে বিরত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে হাদিসও এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

"প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিতরাতের উপর। এরপর তার মা-বাপ তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোন কানকাটা দেখতে পাও?" (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিতরাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাপ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্তধর্মী বানিয়ে ফেলে।) (সহীহ বুখারী: ১৩৫৮; সহীহ মুসলিম: ২৬৫৮)

এছাড়া কুরআনেও উত্তম আখলাক অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা নাহল: ৯০)

পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে, উক্ত গুণাবলীর উপর সন্তানাদিকে গড়ে তোলা। এছাড়াও তাদেরকে আগ্রহী করে তুলতে হবে ইখলাস, নবীজির অনুসরণ, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও দুর্বলকে সহমর্মিতা প্রদর্শনের প্রতি। তাদেরকে বোঝাতে হবে সময়ের হেফাজত, আমানত যথাযথ পৌঁছে দেওয়া এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের গুরুত্ব। পাশাপাশি প্রতিবেশীদের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা, লজ্জাশীলতা বজায় রাখা, সহনশীলতা ও ক্ষমার মতো মহৎ গুণাবলীর দিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, "শিশুর চরিত্র গঠনের প্রতি মনোযোগী হওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি। কেননা শৈশবে অভিভাবক তাকে যেই স্বভাব শেখাবে সেভাবেই সে বেড়ে উঠবে। ছোটবেলায় যদি কারো মধ্যে বদমেজাজ, রাগ, গোঁয়ার্তুমি, নির্বুদ্ধিতা, কঠোরতা, লোভ ও নিজের মনমতো চলার স্বভাব তৈরি হয়ে যায় বড় হয়ে এগুলো দূর করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বরং এসবই হয়ে ওঠে তার মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যতই সে এগুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুক না কেন, কোনো না কোনোদিন এগুলোর কারণে তাকে অপমানিত হতেই হবে। এজন্যেই অনেককে দেখবেন, হঠাৎ তাদের স্বভাব পাল্টে যায়। এটা মূলত তাদের শৈশবকালীন খারাপ তরবিয়তের প্রভাব।

এজন্যই বুঝ হওয়ার পর থেকে শিশুকে বেহুদা ও খারাপ আসর থেকে দূরে রাখা জরুরি। গান বাদ্য, অশ্লীল ও দ্বীন বিরোধী কাজ এবং কথাবার্তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা আবশ্যক। কেননা ছোট থেকে এসব শুনে শুনে বড় হলে পরে এগুলো বাদ দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অভিভাবকরাও তখন সন্তানকে এসব থেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হন। কারণ স্বভাব প্রকৃতি বদলানো সবচেয়ে কঠিন একটি কাজ। এর জন্য নতুন এক প্রকৃতির দরকার হয়। আগের প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসাটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

মরণঘাতী বিষ থেকে যেভাবে দূরে রাখা হয় তার চেয়েও বেশি গুরুত্বের সাথে সন্তানকে মিথ্যা ও খেয়ানত থেকে দূরে রাখতে হবে। কেননা সন্তান যদি মিথ্যা ও খেয়ানতের পথ চিনে যায় তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য সে হারিয়ে ফেলবে। সব ধরনের কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। এছাড়া সন্তানকে অলসতা, বেকারত্ব, আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জীবন থেকে দূরে রাখা জরুরি।

শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে সন্তানকে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার ও গনিমত বন্টনের সময়। এ সময়ে মানুষ তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। একশ্রেণী আল্লাহর বন্টন থেকে অল্প কিছু পায়, আরেক শ্রেণী পায় অনেক বেশি। আর তৃতীয় শ্রেণি (যারা শেষরাতে ওঠে না) একদমই বঞ্চিত থাকে। তো সন্তানের যদি ছোটবেলাতেই শেষ রাতে ওঠা অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে বড় বেলায় তার জন্য ওঠা সহজ হবে।" (ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৩৪৯-৩৫১)

আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে নাসির সা'দী বলেন, "আপনার কর্তব্য পালন ও উচিত কথার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত আপনার সন্তানাদি। কেননা তারা আপনার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। তিনি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের শারীরিক ও মানসিক উপযোগী তরবিয়ত দিতে। আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আপনি কমবেশি যা-ই করেন সেটা আপনার কর্তব্যেরই অংশ। সেই সঙ্গে এটা আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই এ ব্যাপারটায় অনেক বেশি মনোযোগী হোন। এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রাখবেন। সন্তানাদির খাওয়া-পরার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করলে আপনি হবেন কর্তব্য পালনকারী এবং সওয়াব প্রাপ্ত। ঠিক তেমনি-বরং আরো বেশি-সওয়াব পাবেন যদি তাদের মানসিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাটা আপনি করেন। অর্থাৎ তাদেরকে উপকারী ও সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। উত্তম ও প্রশংসিত আচার ব্যবহারের নির্দেশনা দেন। আর খারাপ চরিত্রের ব্যাপারে করেন সতর্ক।

সন্তানকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে যাওয়ার চেয়ে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে যাওয়াটা তাদের জন্য বেশি কল্যাণকর। কেননা সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানেরা উত্তম চরিত্র মাধুরী দিয়ে অনেক দূর যেতে পারবে। সুখী হতে পারবে। সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে তারা আল্লাহ ও বান্দার হক যথাযথ রূপে পালন করতে পারবে। এমনকি এর সাহায্যেই বিভিন্ন ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে তারা বেঁচে থাকতে পারবে। সেই সঙ্গে সদাচরণ করা শিখবে পিতা-মাতার প্রতি।" (আব্দুর রহমান ইবনে নাসির সা'দী, বাহজাতুল কুলুব: পৃ. ১২৫)

সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করা

সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া। তাদেরকে চুমু খাওয়া। সন্তানাদির প্রত্যেকের সাথেই ইনসাফপূর্ণ আচরণ বজায় রাখা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নাতি হাসান হুসাইনকে প্রায় সময় চুমু খেতেন। তিনি বলেন,

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"যে অন্যের প্রতি দয়ালু না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।" (সহীহ বুখারী: ৫৯৯৭; সহীহ মুসলিম: ২৩১৮)

ইবনু কাইয়িমিল জাওয়িয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "পূর্বসূরী আলেমগণ সন্তানদেরকে চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রাখতে পছন্দ করতেন।" (ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৩৩৬)

অতএব সন্তানদের সাথে আচরণের ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে অবহেলা মারাত্মক স্খলন। এর কারণে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের সাথে ইনসাফভিত্তিক আচরণ বজায় রাখ।" (সহীহ বুখারী: ২৫৮৭; সহীহ মুসলিম: ১৬২৩)

ছেলেমেয়ের মধ্যে ইনসাফের স্বরূপ কী তা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, সন্তানাদিকে কিছু দিতে হলে ছেলে ও মেয়েকে সমান সমান দিবে।
কেউ কেউ বলেন, "মেয়েকে ছেলের অর্ধেক দিবে এটাই ইনসাফ।"
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে বিভিন্ন বড় বড় গ্রন্থে।
মোটকথা, বাহ্যিক ও আন্তরিক সকল ক্ষেত্রেই সন্তানদের মাঝে সামর্থানুযায়ী সমতা বজায় রাখা পিতা-মাতার ওপর ওয়াজিব।

ফরজ ইলম শিক্ষা দেওয়া

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তানদেরকে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া।
অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজসমূহ শেখানো। কেননা প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তারা শরীয়তের সম্বোধিত ব্যক্তি হয়ে যায়। তাই ছেলে-মেয়েকে ওযু, ফরজ গোসল, পাক-নাপাক ও নামাজ ইত্যাদির মাসায়েল শেখাতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদেরকে জানাতে হবে পর্দা ও হিজাবের বিধানাবলী।

ইমাম ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ লেখেন, "অধিকাংশ ছেলে মেয়ে নষ্ট হয় পিতা-মাতার কারণে। তারা সন্তানাদির উত্তম শিক্ষা দীক্ষার প্রতি মনোযোগী হয় না। দ্বীনের ফরজ ও জরুরি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে তাদেরকে। এভাবে ছোট বয়সেই সন্তানগুলোকে নষ্ট করে ফেলে তারা। ফলে সন্তানেরা নিজেরাও উপকৃত হয় না।

বড় হয়ে পিতা-মাতারও কোনো কাজে আসে না। এই পিতা-মাতারই অনেক সময় সন্তান অবাধ্য হলে তিরস্কার করে। মুখের ওপর তখন সন্তান বলে দেয়, ছোট বেলায় তুমি আমার হক নষ্ট করেছ। তাই এখন আমি তোমার হক নষ্ট করছি। শৈশবে তুমি আমার প্রতি অবহেলা করেছ। এখন তোমার বার্ধক্যে আমি অবহেলা করছি তোমাকে।" (তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৩৩৭)

এজন্য প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর শরীয়তের যেসব বিষয় জানা সন্তানাদির উপর ফরজ সেগুলো তাদেরকে শেখানো পিতা-মাতার কাছে প্রাপ্য সন্তানের হক।

নেককার স্বামী/স্ত্রী বাছাই করে দেওয়া

ছেলের জন্য নেককার ও উপযোগী স্ত্রী এবং মেয়ের জন্য নেককার ও উপযোগী স্বামী নির্বাচন করা। এটা সন্তানের প্রতি চূড়ান্ত শুভাকাঙ্ক্ষার লক্ষণ এবং তাদের অধিকারের অন্যতম বাস্তবায়ন। মেয়েকে তার অপছন্দের পাত্রের সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়া থাকে বেঁচে থাকা জরুরি। বিশেষত দ্বীনদার না থাকা কিংবা স্বল্পতার কারণে যদি মেয়ে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, তাহলে সেখানে তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া যাবে না কোনোভাবেই।

এখানে আমরা জোর দিয়ে বলছি, মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা পিতা-মাতার ওপর ওয়াজিব। মেয়ের জন্য এমন স্বামী তাদের খুঁজে বের করতে হবে, যে মেয়ের দ্বীন-দুনিয়া হেফাজতে রাখবে। তার জন্য উপকারী হবে। তার ব্যাপারে আমানতদার হবে।

ছেলে বা মেয়ে যাই হোক হীনমন্য না হয়ে উত্তম তরবিয়ত করা এবং আল্লাহর আছে দু'আ করা

জন্মের পর সন্তানের জন্য দু'আ করা যেন সে যোগ্য, নেককার, বিশুদ্ধবাদী এবং আল্লাহর বিশেষ তাওফিকপ্রাপ্ত হয়। কোনোভাবেই তাদের জন্য বদদুআ করা যাবে না। পিতা হযরত আবু বকর রা. কর্তৃক নিজ সন্তানদের জন্য করা এই দু'আটি বিবৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে,

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

"আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মশীল বানান।" (সূরা আহকাফ: ১৫)

আল্লাহ যাকে কন্যা সন্তান দান করেন তার উচিত নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ٤٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا

"তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন যাকে ইচ্ছা ছেলে দান করেন। অথবা ছেলে মেয়ে উভয়টাই দেন। আর যাকে চান তাকে বানান বন্ধ্যা।" (সূরা শূরা: ৪৯-৫০)

ছেলে-মেয়ে দেওয়া বা না দেওয়া সম্পূর্ণই আল্লাহ পাকের হিকমত ও ইচ্ছার ব্যাপার। তাঁর নির্ধারিত তাকদির আটকানোর সাধ্য কারো নেই। সুতরাং সন্তানের ব্যাপারটা পুরোপুরি আল্লাহর হাতে।

আর তাই বান্দার দায়িত্ব হচ্ছে, মেয়ে সন্তান নিয়ে কোনোরকম হীনমন্যতায় না ভোগা। সবগুলো সন্তান কিংবা অধিকাংশ সন্তান মেয়ে হলেও তাদের তরবিয়তের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া। এতে সে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।

আয়েশা রাযি, বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِى غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتَهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: مَنْ بَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

“একদা এক মহিলা তার দু'টি মেয়েকে সাথে নিয়ে এসে আমার কাছে কিছু চাইল। আমার কাছে তখন একটি মাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেটাই আমি তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলাটি খেজুরটি নিয়ে সেটা তার দু'মেয়েকে ভাগ করে দিল। তারপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতোমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তাকে ঘটনাটি জানালাম। সব শুনে তিনি বললেন, “যে কেউ কন্যাসন্তানদের দ্বারা কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তারপর সে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তার জন্য তারা জাহান্নামের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হবে।” (সহীহ বুখারী: ৫৯৯৫; সহীহ মুসলিম: ২৬২৯)

সন্তানদের প্রয়োজনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং তাদের অভিযোগ-অনুযোগ মনযোগ দিয়ে শোনা

ছেলে মেয়ের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তারা কোনো সমস্যায় পড়লে সেটা সমাধানের জন্য তাদের সাথে বসা।

পার্থিব জীবনে মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে, এটাই স্বাভাবিক। ছেলে মেয়েও এই বাস্তবতার বাইরে নয়। তাদের বয়স যত বাড়বে ততই বিভিন্ন ধরণের সমস্যা তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরবে। তাদের অভিযোগও থাকবে অনেক। সেসব অভিযোগ পিতা-মাতাকে শুনে সেগুলো সমাধানের চেষ্টাও করতে হবে তাদের। শিশুকালে সন্তানদের প্রতি যেভাবে খেয়াল রাখতে হয় সেভাবে বড় হওয়ার পর রাখতে হয় না। তখন তাদের প্রতি খেয়াল রাখার পদ্ধতিটা হতে হয় ভিন্ন।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের হক ও অধিকার শুরু হয় মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়ই। পেট থেকে বেরোনোর পর দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় তাদের কিছু হক থাকে। এভাবে শৈশব,

কৈশোর এবং পূর্ণ যৌবনেও সন্তানদের পিতা-মাতার ওপর কিছু অধিকার থাকে। জীবনের প্রতিটি স্তরেই সন্তানরা সেসব অধিকার প্রাপ্য হয় পিতা-মাতার কাছে। তাদের হক ও অধিকার ফুরিয়ে যায় না কখনো। প্রত্যেক স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকারগুলো স্বতন্ত্র। সেগুলো পালনের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন।

তো সন্তানকে যদি ছোটকাল থেকেই উত্তম তরবিয়ত দিয়ে গড়ে তোলা যায় তাহলে সেটা বড়বেলায় তার জন্য বেশ উপকারী হয়। পক্ষান্তরে ছোট সময় যদি তরবিয়তে অবহেলা করা হয় তাহলে তার বয়স যত বাড়বে ততই তার খারাপ কাজকর্ম প্রকাশ পাবে। পিতামাতার সাথে তার আচরণ হবে দৃষ্টিকটু। তাদের কথা মানবে না সে। তখন পিতা-মাতার হয়তো মনে হবে, সন্তান কথা শোনে না কেন? আসলে এর মূল কারণ তো হচ্ছে, ছোটবেলায় সন্তানের তরবিয়তে অবহেলা করেছে তারা।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ লেখেন, "বহু এমন পিতা-মাতা আছে যারা নিজ সন্তানের কপালে নিজ হাতেই ইহকালীন ও পরকালীন দুর্ভাগ্যের কলঙ্কতীলক সেঁটে দেয়। তারা নিজ সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেয় না। সন্তান যেভাবে চায় সেভাবেই চলতে দেয়। এগুলো করে সেই পিতা-মাতা মনে করে, নিজ সন্তানকে তারা সম্মানিত করছে। আসলে তো তারা তাদেরকে অপদস্থ করছে। তারা ভাবে, এগুলো সন্তানের প্রতি তাদের স্নেহ ও আদর। অথচ এর মাধ্যমে তো জুলুম করা হচ্ছে সন্তানদের প্রতি। একসময় সেই সন্তান পিতা-মাতার কোনো কাজে আসে না। দুনিয়া ও আখেরাতে সে হয় চূড়ান্ত বিপর্যস্ত। সমাজে আপনি যত খারাপ ছেলেপেলে দেখবেন তাদের অধিকাংশের জন্য দায়ী তাদের পিতা-মাতা।" (ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৩৫১)

এজন্যেই আমি বলি, পিতা-মাতার কাছে সন্তানের অন্যতম প্রাপ্য হক হচ্ছে, তাদের অভিযোগ-অনুযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনা। এরপর উপযোগী ও যৌক্তিক উপায়ে তার সমাধানের চেষ্টা করা। পূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে সেগুলো ডিল করা।

কিছু ক্ষেত্রে সন্তানের সাথে কঠোরতা দেখাতে হয় আবার কখনো সখনো কিছু বিষয় দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। এ সবই নির্ধারিত হবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। সমস্যা ও অভিযোগের ভিত্তিতে। আবার অনেক সময় সন্তানেরা নিজ থেকে কিছুই বলেনা। তবে তারা এমন কোনো পেরেশানিতে থাকে, যখন তাদের পরামর্শের প্রয়োজন হয়। এমন মূহুর্তে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম পরামর্শদাতা হতে পারেন পিতা-মাতা।

এভাবে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কটা মজবুত হলে, তাদের মধ্যকার সেতুবন্ধনটা ঠিক থাকলে এবং তরবিয়তদানে আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল ও সৎ থাকতে পারলে সব সমস্যারই সমাধান সম্ভব। সন্তানের যে কোনো অভিযোগ-অনুযোগ দূর করা সহজ।

মোটকথা দুনিয়াতে সমস্যার শেষ নেই, ব্যস্ততারও কূলকিনারা নেই। এছাড়া দায়িত্ব ভুলিয়ে দেওয়ার মতো উপকরণেরও অভাব নেই। সবকিছুর পরেও আমাদের মনে রাখতে হবে, ছেলেমেয়েদের বিশেষ তরবিয়ত, নিয়ন্ত্রণ ও শাসন দরকার। তাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশা জাগিয়ে তোলা জরুরি। আল্লাহর মুহাব্বত ও ভালোবাসা তাদের অন্তরে গেঁথে দেওয়া আবশ্যক। এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েকে এভাবে বড় করতে হবে।

দুনিয়ার এ জীবনটা কিছু সময়ের সমষ্টি মাত্র। এই সময়টাতে যে ভালো কাজ করবে পরকালে গিয়ে সে তার ভালো প্রতিদানে পাবে। আর যে এ সময় খারাপ করবে-আল্লাহ না করুন-পরকালে তার প্রতিদানটাও তেমনই হবে। কখনো অন্যকে দোষারোপ করা উচিত না। নিজের দায়িত্বটুকু পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাওয়া দরকার। তাহলেই আল্লাহর কাছে গিয়ে মুক্তি পাওয়া যাবে। আর আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতিত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।

সন্তানের অবসর সময়কে কাজে লাগানো

সন্তানের অবসর সময়টাকে কাজে লাগানো। মানুষের জীবনে সময়ের কী গুরুত্ব, তা জ্ঞানী মাত্রই বুঝেন। আল্লামা ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ 'ফাওয়াঈদ' গ্রন্থে বলেন, "সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়েও ক্ষতিকর। কেননা সময় নষ্ট করলে আল্লাহ এবং পরকাল হারাতে হয়। পক্ষান্তরে মৃত্যু হলে দুনিয়া ও তার অধিবাসীদের হারাতে হয়।" (ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, ফাওয়াঈদ: পৃ. ৩৩)

সময় কোনো উপকারী ও ভালো কাজে না লাগালে তা ক্ষতিকর অনর্থক কাজে ব্যয় হবে অবশ্যই। সালাফের জীবনী পড়লে দেখবেন, তারা কখনো ক্ষতিকর কিংবা ধ্বংসাত্মক কাজে নিজের সময় নষ্ট করতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونُ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“দুটি নিআমত এমন আছে, যেগুলোতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হল, সুস্থতা আর অবসর।” (সহীহ বুখারী: ৬৪১২)

ইমাম হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমি যেই আকাবিরের সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁদের প্রত্যেকেই অর্থ সম্পদের চেয়ে সময়ের প্রতি বেশি যত্নবান ছিলেন।” (ইমাম বাগাবি, শরহুস সুন্নাহ: ১৪/২২৫)

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী সুলামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আমার জানামতে জীবনের কোনো সময় আমি খেল তামাশায় নষ্ট করি নি।” (ইমাম যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২০/২৬; ইবনে মুফলিহ, আল আদাবুশ শরঈয়্যাহ: ৩/৪৬৭)

মা'রিফাতুল কুররাইল কিবার গ্রন্থে আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের জীবনীতে এসেছে, জীবনের প্রতিটা সময় তিনি হেফাজত করতেন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত তাঁর কাটত পড়াশোনায় বা জিকিরে কিংবা তাহাজ্জুদে অথবা দরসে।

বিশিষ্ট ভাষাবিদ খলিল ইবনে আহমদ ফারাহিদী বলতেন, “যে সময়টায় আমি খাবার খাই সেটা আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টের সময়।”
মোট কথা, সন্তানের সময়টাকে ইহকালীন বা পরকালীন উপকারী কোনো কাজে লাগানো। যেমন, দুনিয়া ও আখেরাতে তার কাজে লাগবে এমন কিছু তাকে শেখানো।

এক সময় বসে সন্তানের জন্য একটা রুটিন তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। সেখানে তার সময়গুলো সুশৃংখল ভাবে ভাগ করা থাকবে। একটা সময় থাকবে পড়াশোনার। আরেকটা সময় থাকবে বৈধ বিনোদনের জন্য। কিছু সময় থাকবে সাংস্কৃতিক এক্টিভিটিজের জন্য। আবার ইন্টারনেটে সময় থাকবে খাবার দাবারের জন্য বরাদ্দ।

এভাবে তার পুরো সময়টা ব্যয় হবে উপকারী বিভিন্ন কাজে। তাহলে সন্তানগুলো সমাজের জন্য উপকারী হয়ে ওঠবে। তারা বিভিন্ন কাজে লাগবে।

এরকম আরো বিভিন্ন পদ্ধতিতেই সন্তানের সময় গুলোকে উপকারী কাজে লাগানো যায়।

আমরা দেখতে পাই, কিছু ছেলেপেলে মানসিক বিকৃতির শিকার হয়ে যায়। সেই বিকৃতি হতে পারে নিজেদের যৌন চাহিদা কেন্দ্রিক, কিংবা বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ কেন্দ্রিক। এর পেছনে অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে, পিতা-মাতার পক্ষ থেকে পারিবারিক তরবিয়ত না থাকা। মা বাবা কর্তৃক সন্তানদের হক আদায় না করা। এটাই এর সুস্পষ্ট কারণ। হয়তো সন্তানদের সময়টাকে উপকারী কোনো কাজে লাগানো হয়নি। কিংবা খোদ পিতা-মাতাও সেসব মানসিক বিকৃতির শিকার। ফলে তাদের সন্তানরাও হয়েছে তাদের মতোই। কবির ভাষায় বলতে হয়, ছোট বাচ্চারা গড়ে ওঠে সেভাবে, বাবারা তাদের গড়ে তোলে যেভাবে।

কেননা এখানে ভালো আদর্শ সেই সন্তানদের সামনে অনুপস্থিত ফলে তারা বিকৃতির শিকার হয়ে যায়।

সেজন্যে কিছু প্রবৃত্তিপূজারী ছাত্র ও যুবকদের অবসর সময়টাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। সেই সময়টাতে তাদেরকে সরল পথ থেকে সরিয়ে দিতে বিভিন্ন আয়োজন করে থাকে। কেননা পিতা-মাতা তো সন্তানদেরকে ব্যস্ত রাখার পদ্ধতি জানেন না, তাই অন্যরা তাদের ব্যস্ত করে রাখে। একসময় গিয়ে সেই পিতা-মাতা অনুভব করতে পারেন, তার সন্তান আর তার কথা শুনছে না। সে বিকৃত, বিচ্ছিন্ন ও ভ্রষ্ট মতবাদে জড়িয়ে গেছে। অথবা বিশ্বাসিক ও আদর্শিক বিকৃতির শিকার হয়ে গেছে। কিংবা যুবক ছেলে-মেয়ের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তখন পিতা-মাতা অনুতাপে চিৎকার করে কাঁদেন। কিন্তু তখন কেঁদে কী লাভ! লজ্জিত হয়েই বা কী ফায়দা!! সময় গেলে তো কিছুই সাধন হয় না।
তো সন্তানদের নষ্ট হওয়ার পেছনে মূল দায়ী পিতা-মাতায়েরাই। হয়তো তারা নিজেরাই বিকৃত মানসিকতার অধিকারী। কিংবা তারা নিজেরা সেরকম না। কিন্তু তারা পরীক্ষায় পড়ে গেছেন সন্তানদের জন্য নির্জনে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করেননি।

ইমাম ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ লেখেন, "বহু এমন পিতা-মাতা আছে যারা নিজ সন্তানের কপালে নিজ হাতেই ইহকালীন ও পরকালীন দূর্ভাগ্যের কলঙ্কতীলক সেঁটে দেয়। তারা নিজ সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেয় না। সন্তান যেভাবে চায় সেভাবেই চলতে দেয়। এগুলো করে সেই পিতা-মাতা মনে করে, নিজ সন্তানকে তারা সম্মানিত করছে। আসলে তো তারা তাদেরকে অপদস্থ করছে। তারা ভাবে, এগুলো সন্তানের প্রতি তাদের স্নেহ ও আদর। অথচ এর মাধ্যমে তো জুলুম করা হচ্ছে সন্তানদের প্রতি। একসময় সেই সন্তান পিতা-মাতার কোনো কাজে আসে না। দুনিয়া ও আখেরাতে সে হয় চূড়ান্ত বিপর্যস্ত। সমাজে আপনি যত

খারাপ ছেলেপেলে দেখবেন তাদের অধিকাংশের জন্য দায়ী তাদের পিতা-মাতা।" (ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৩৫১)

তিনি আরো লেখেন, "অধিকাংশ ছেলে মেয়ে নষ্ট হয় পিতা-মাতার কারণে। তারা সন্তানাদির উত্তম শিক্ষা দীক্ষার প্রতি মনোযোগী হয় না। দ্বীনের ফরজ ও জরুরি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে তাদেরকে। এভাবে ছোট বয়সেই সন্তানগুলোকে নষ্ট করে ফেলে তারা। ফলে সন্তানেরা নিজেরাও উপকৃত হয় না। বড় হয়ে পিতা-মাতারও কোনো কাজে আসে না। এই পিতা-মাতাই অনেক সময় সন্তান অবাধ্য হলে তিরস্কার করে। মুখের ওপর তখন সন্তান বলে দেয়, "ছোট বেলায় তুমি আমার হক নষ্ট করেছ। তাই এখন আমি তোমার হক নষ্ট করছি। শৈশবে তুমি আমার প্রতি অবহেলা করেছ। এখন তোমার বার্ধক্যে আমি অবহেলা করছি তোমাকে।" (তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ: পৃ. ৩৩৭)

সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে তাদের সামনে উত্তম আদর্শ থাকা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়ে পিতা-মাতার সচেতন থাকা জরুরি। তাদের উচিত, সন্তানদের সামনে উত্তম চরিত্র ও সঠিক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পেশ করা। নিজে কোনো বিষয়ে অবহেলা করে সে বিষয়ে ছেলেমেয়েকে নির্দেশ দেওয়া ঠিক না। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত একটি কথা।

এমনটা তো কখনোই সম্ভব না। কারণ, সন্তানেরা পিতা-মাতার অনুসরণের প্রকৃতি নিয়েই জন্ম নেয়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সন্তান পিতা-মাতার অনুকরণ করে। সেজন্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে যেই বিকৃতি দেখা যায় সেটার পেছনে মূলত পরিবারই দায়ী। ছেলেমেয়ে পিতা-মাতার মধ্যে একটা বিষয় দেখে সেটাই সে চেতনে বা অবচেতনে নিজের মধ্যে ধারণ করে নেয়। তাই এ ব্যাপারটায় দৃষ্টি রাখা অতীব জরুরি।

যারা নিজ সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি চান তাদের উচিত নিজেদেরকে তাদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পেশ করা। যে আদর্শ আল্লাহর নির্দেশ নিজেরা আদায় করবে এবং কায়েম করবে। কখনোই আল্লাহর সীমা লংঘন করবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

"এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। অতএব তোমরা তা লঙ্ঘন করবে না।" (সূরা বাকারা: ২২৯)

আরেক জায়গায় এসেছে,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

“এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। এগুলোর কাছাকাছিও হয়ো না কখনো।” (সূরা বাকারা: ১৮৭)

আরেক আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“আর যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করল সে নিজের প্রতি জুলুম করল।” (সূরা ত্বালাক: ১)

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, সন্তানাদির তরবিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মহান দায়িত্ব। তবে আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য এটা পালন করা সহজতর। তাই বান্দার উচিত সবসময় আল্লাহর কাছে দুআ করা এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। যেন তিনি সঠিক পথ দেখান, নেককার সন্তান দান করেন এবং সবার দুনিয়া ও আখেরাত ঠিক করে দেন।

পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পারিক সম্পর্কের প্রভাব

মানব জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সম্পর্ক পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতাকে সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সন্তানদের ওপর তাদের প্রতি সম্মান, আনুগত্য ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

পিতা-মাতা সন্তানের পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সুন্দর পরিবার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে পিতা-মাতা যেমন সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনে যত্নশীল হয়ে ওঠে, তেমনি সন্তানও পিতা-মাতার হক্ক আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। পারস্পরিক সুসম্পর্কের দরুন সন্তানের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো ইতিবাচকভাবে বিকশিত হয়। পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের গুরুত্ব কতটুকু তা আমাদের দ্বীনি পরিবার ও পশ্চিমা সভ্যতার আদলে গঠিত পরিবার গুলোর সাথে তুলনা করলে সহজেই বুঝতে পারি।

একজন শিশু জন্মের পর থেকেই পিতা-মাতার স্নেহ, ভালোবাসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। তার চিন্তাভাবনা, আচরণ, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন গঠনে পিতা-মাতার প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকে। পরিবারই সন্তানের প্রথম শিক্ষাঙ্গন আর পিতা-মাতাই তার প্রথম শিক্ষক। ফলে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক যত গভীর ও আন্তরিক হবে, তাদের শিক্ষা, আদর্শ ও জীবনবোধ সন্তানের মাঝে তত বেশি প্রতিফলিত হবে।

পশ্চিমা সভ্যতার আদলে গড়া পরিবার গুলোতে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে না থাকে ভালোবাসা, না থাকে যত্ন, না থাকে স্নেহ, না থাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা। সন্তানেরা ভুলে যায় তাদের জন্য পিতা-মাতার খেদমত করা ওয়াজিব করা হয়েছে। তারা ভুলে যায় নবী (সা.) পিতা-মাতার সাথে উফ্ শব্দ পর্যন্ত করতে নিষেধ করেছেন। এই ভুলে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই পিতা-মাতার জায়গা হয় বৃদ্ধাশ্রমে, কখনো বা নিজ বাড়িতেই একাকি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এই বৃদ্ধ পিতা-মাতা। সন্তান তাদের খোঁজও রাখে না। একই পাতার উল্টা দিকে পিতা-মাতার যথাযথ শিক্ষা দানের অভাব তাদের মধ্যেকার সুসম্পর্কের সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বাঁধা দেয়। ফলে তারা বিপথগামী হয়ে যায়।

অন্যদিকে একটি দ্বীনি মুসলিম পরিবারে পিতা-মাতা তাদের সন্তানের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদোর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সন্তানরা ছোট থেকেই দায়িত্বশীল হয়ে বেড়ে উঠে। ফলে তারা তাদের পিতা-মাতার হক আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠে।

সন্তানের জীবনে পিতা-মাতার প্রভাব কতটা গভীর, তা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর একটি হাদিস থেকেও স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে সন্তানের আকীদা, চরিত্র, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন গঠনে পিতা-মাতার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ! একটি শিশু জন্মগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ, সংস্কৃতি বা আচরণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না; বরং সে তার পরিবার ও পরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে সেগুলো অর্জন করে।

তাই সন্তানকে দ্বীনদার, সচ্চরিত্র, দায়িত্বশীল ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পিতা-মাতার নিজেদের জীবনেও ইসলামী আদর্শ, উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। কারণ সন্তান অনেক সময় পিতা-মাতার কথার চেয়ে তাদের কাজ থেকেই বেশি শিক্ষা গ্রহণ করে।

আধুনিক সমাজে চ্যালেঞ্জ ও করনীয়

সন্তান প্রতিপালন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পিতা-মাতার ওপর অর্পিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত ও গুরুদায়িত্ব। প্রত্যেক পিতা-মাতা তাদের অধীনস্থ সন্তানদের বিষয়ে দায়িত্বশীল এবং কিয়ামতের দিন এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

বর্তমান যুগে এই দায়িত্ব পালন পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক চ্যালেঞ্জপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার, সামাজিক পরিবর্তন এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এর প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে।

আধুনিক যুগের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:

❖ ডিজিটাল আসক্তি ও প্রযুক্তির অপব্যবহার:

বর্তমান সময়ে স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শিশু-কিশোরদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে তারা অশালীন কনটেন্ট, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং অপসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে, যা তাদের চরিত্র, মনোযোগ ও ঈমানী চেতনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

❖ পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা:

আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সময় ও আবেগগত সংযোগ কমে যাচ্ছে। ফলে সন্তানের মধ্যে একাকীত্ব, মানসিক অস্থিরতা এবং ভুল সঙ্গ গ্রহণের প্রবণতা

❖ নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়:

অনেক পরিবারে সন্তানের দুনিয়াবি সাফল্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও তার উত্তম আখলাক, শিষ্টাচার ও দ্বীনি মেজাজ গঠনের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। এর ফলে সন্তান জাগতিকভাবে সফল হলেও নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

❖ অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা ও মানসিক চাপ:

শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা শিশুদের স্বাভাবিক শৈশব, মানসিক বিকাশ ও আত্মিক প্রশান্তিকে ব্যাহত করছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়:

❖ বন্ধুত্বপূর্ণ ও আস্থাভিত্তিক সম্পর্ক গঠন:

সন্তানের সঙ্গে শাসনের পাশাপাশি ভালোবাসা ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে নির্ভয়ে নিজের কথা ও সমস্যা প্রকাশ করতে পারে।

❖ নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি ব্যবহার:

প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করে এর ব্যবহারকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে রাখতে হবে এবং উপকারী কাজে অভ্যস্ত করতে হবে।

❖ ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখা:

পরিবারে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দুআ, আদব-আখলাকের আলোচনা ও ঘরোয়া তালিমের চর্চা নিয়মিত রাখতে হবে, যাতে সন্তান ছোটবেলা থেকেই দ্বীনি পরিবেশে গড়ে ওঠে।

সর্বোপরি, ধৈর্য, দু'আ, সচেতনতা এবং কুরআন ও সুন্নাহর দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে বর্তমান যুগের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে একজন সন্তানকে নেককার, দায়িত্বশীল ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহভীরু চক্ষুশীতলকারী সন্তান দান করুক যারা ইহকাল এবং পরকালে পিতা-মাতার সৌভাগ্যের কারণ হবে।

উপসংহার

মুমিনের জীবনে আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি অধিকার পিতা-মাতার। এ থেকেই অনুমেয় পিতা-মাতার উপরে সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক আমানত। তাদেরকে সঠিকভাবে লালনপালন করা, দ্বীন ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া, চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা— এগুলো পিতা-মাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শুধু খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় প্রদান নয়; বরং তাদের হৃদয়ে ঈমান, তাক্বওয়া ও সৎচরিত্রের বীজ রোপণ করাই প্রকৃত দায়িত্ব পালন।

যদি পিতামাতা সন্তানের ইহকাল ও পরকাল উভয়ের কল্যাণের প্রতি যত্নবান হন, তবে সেটিই তাদের জন্য সওয়াব ও দুনিয়া-আখেরাতের সাফল্যের পথ খুলে দেয়। তাই আমাদের উচিত সন্তানকে দুনিয়ায় নয়, আখেরাতের সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

দু'আ করি যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে নেককার, উপকারী ও সংস্কারক সন্তান দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহা দানশীল ও সম্মানিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর মর্জিমাফিক চলার তৌফিক দান করুন। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর আল্লাহ দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

তথ্যসূত্র

আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামের পরিবারিক জীবন*, বর্ণালী বুক সেন্টার, ঢাকা ১৯৯৭

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী, *মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার*, লোকমান প্রকাশনী, ঢাকা ২০২৪

ইবনু জাওযি রাহিমাহুল্লাহ, *মা-বাবা: আমার জান্নাত*, আযান, প্রকাশনী, ঢাকা ২০২১

ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, *আল-ফাওয়াইদ*, দারুল ফালাহ, ঢাকা ২০২৫

ইবন কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ, *তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলুদ*

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি, *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম*

ড. করিম আশ শাযিল, *আপনি যখন বাবা*, সুকুন পাবলিশিং, ঢাকা ২০২৫

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান, *ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ*, সবুজপত্র, ঢাকা ২০০৪

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, *সন্তান প্রতিপালনে এ যুগের চ্যালেঞ্জ*, সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকা ২০২৩

ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী রহ., *তাম্বীহুল গাফিলিন*, আনোয়ার লাইব্রেরী, ঢাকা ২০১৯

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., *সন্তান প্রতিপালন ও পরিচর্যা*, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা ২০২৪

মাওলানা মুহাম্মাদ হারুন মুআবিয়া, *মাতা-পিতার অধিকার ও সন্তানের দায়িত্ব*, আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৯

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহিম বুখারী, *যখন আপনি বাবা-মা*, নহর প্রকাশন, ঢাকা ২০২৫

হাফেজ মাওলানা মুফতী আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, মা-*বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য*, আশরাফিয়া বুক হাউজ, ঢাকা ২০১৬